দুটী কথা

শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক
প্রণীত।

দুটী কথা।

শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

GREAT TOWN PRESS.

1898.

পরম পূজনীয়

পিতৃদেব

৺ যদুলাল মল্লিক মহাশয়ের

পবিত্র পাদপদ্মে

এই গ্রন্থ

ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম।

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনে যাহা কিছু লিখিবার, তাহার প্রায় কিছুই নাই; কারণ, পুস্তকখানির আকার অতি ক্ষুদ্র, কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিলে, ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করা যায়; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইহা নাটক বা নভেল নহে; ইহাতে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধীয় **দু'একটী কথা** উল্লিখিত আছে, এবং তাহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি, তথাপি তাহাতে যে কৃতকার্য্য হইয়াছি, এরূপ আশা করা যায় না। যাহা হউক, যদি ইহা জনসাধারণের অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে পাঠোপযোগী ও আনন্দদায়ক হয়, তাহা হইলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শেষ বক্তব্য এই যে, যদি কোন স্থলে কোনরূপ ত্রুটি বা প্রমাদ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা আমাকে জানাইলে, আমি যার-পর-নাই বাধিত হইব।

কলিকাতা,
সন ১৩০৪ সাল।

শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিষ্য। পরম পিতা পরমেশ্বর যদি সর্ব্বব্যাপী, যদি সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তবে লোকের প্রবৃত্তি পাপ-পথ-গামিনী হয় কেন? ইহার মীমাংসা করিবার নিমিত্তই অদ্য আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি গুরু-দেব, আপনি আমার এই অজ্ঞান-তিমির নাশ না করিলে আর কে করিবে?

গুরু। বৎস! তোমার ঈদৃশ ভাব দর্শনে আমি যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়াছি, অন্যান্য দিন আসিয়া থাক, ধর্ম্ম-বিষয়ক বাদানুবাদে মনঃসংযোগ করা দূরে থাকুক, তাঁহাতে একবার কর্ণপাতও কর না। অদ্য সহসা এভাব উপস্থিত কেন? কি ঘটনা আপতিত হইল, যাহাতে

তোমার অন্তঃকরণের এইরূপ ভাবান্তর দেখিতেছি। বল, সাধ্যমত ইহার মীমাংসা করিতে ত্রুটি করিব না।

শিষ্য। গুরুদেব! কল্য সন্ধ্যাসমাগম সময়ে পুণ্য-তোয়া ভাগীরথীর পবিত্র তটে বিচরণ করিতেছিলাম, মধ্যে মধ্যে মৃদুমন্দ সমীরণে ও জাহ্নবীর কল কল ধ্বনিতে আমার অন্তঃকরণে কি এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতেছিল। লীলাময়ীর অনন্তলীলা-লহরী দর্শনে ও নির্ম্মল বায়ু সেবনে কাহার না হৃদয়ে আনন্দ-প্রবাহ লহরে লহরে নৃত্য করিতে থাকে? এইরূপ প্রকৃতির মধুরিমায় মনঃপ্রাণ জড়বৎ হইয়া রহিল। পরে চিন্তাদেবীর ঘন-আলিঙ্গনে সেই জড়তার ভঙ্গ হইল। পৃথিবীর ক্রিয়াকলাপ মনে উদিত হইয়া তাহাকে আলোড়িত করিতে লাগিল। স্মৃতিচিত্রকরী কোমল করপল্লবে নানা বর্ণের তুলিকা ধারণ করিয়া মানসপটে জগতীস্থ প্রাণিবর্গের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র সকল অঙ্কিত করিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়পরায়ণেরা স্ব স্ব ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তির জন্য নানাবিধ ভীষণ ও ঘৃণিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এবং ঐ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলকে কিঞ্চিৎমাত্র পাপজনক জ্ঞান করে না, যে কোন উপায়েই হউক, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করিতে পারিলে, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। এইপবিত্র জাহ্নবীতট যেমন শান্তিনিকেতন,

তেমনই আবার অশান্তির আগার। একদিন কোন অসামান্য-রূপ-যৌবন-সম্পন্না সরলা বালা ভাগীরথীর নির্ম্মল সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্না রহিয়াছে দেখিলাম। আহা! সেই ললনা পৃথিবীর সর্ব্বস্বধন স্বামিরত্ন হারাইয়া হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন। তাহার এই ভাব দর্শনে আমার হৃদয় একবারে আনন্দ রসে আপ্লুত হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সেই অবলার অমূল্য সতীত্বরত্ন হরণের নিমিত্ত সন্নিহিত যুবকদ্বয়ের জল্পনা শ্রবণ করিয়া মনে সাতিশয় ঘৃণার উদ্রেক হইল। এই সময়ে আমার অন্তঃকরণ আনন্দ ও বীভৎস রসে যুগপৎ অভিষিক্ত হইয়া কিরূপ অধীর হইয়া উঠিল, এক্ষণে তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম। মনে তখন নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল। গুরুদেব! ক্ষমা করিবেন, আমি কারণান্বেষী। একবার ভাবিলাম, জগদীশ্বর যদি সর্ব্বব্যাপী, সকলের হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে বাস করিতেছেন, তবে কেন একজন ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতেছে, অপরেই বা কেন ঘোরতর দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছে? আবার পরক্ষণেই মনে হইল, পরম পিতার নিকট দেশ-কাল ও পাত্রভেদে পাপ পুণ্য ভেদ! আমি যাহাকে পাপ বলিয়া জ্ঞান করি, অন্যে তাহাকেই পুণ্য বলিয়া জ্ঞান

করেন। ধন্য কৃপানিধান! আপনার লীলা অনন্ত। আপনার অসীম মহিমা আমা হেন ক্ষুদ্রজনে বুঝিতে প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

দেব! আপনি ভিন্ন ভিন্ন লোককে ভিন্ন ভিন্ন মতি দিয়া সুখের ধূয়া তুলিয়া তাহাদিগকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কেহবা বিজন কাননে দুরারোহ গিরি-কন্দরে মুদ্রিত নয়নে যোগাসনে বসিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্ম চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। কেহবা স্ফটিক নির্ম্মিত গগন-ভেদী প্রাসাদে বান্ধবগণ পরিবেষ্টিত হইয়া অপ্সরা বিনিন্দিত কলভাষিণী চপলেক্ষণা বারাঙ্গনাগণের কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত সুধা পান করিতে করিতে আনন্দ সাগরে অঙ্গ ভাসাইয়া দিতেছেন। ইহাদিগের আশা একই; কিন্তু মতিগতি ভিন্ন, রুচি ভিন্ন। যোগী ভাবিতেছেন, পরম পিতার শ্রীচরণে মতি স্থির করিয়া শান্তি সুখ লাভ করিবেন; ধনী ভাবিতেছেন, নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদ দ্বারা সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণা, শোক দুঃখ, অপনোদন করিয়া সুখী হইবেন। সত্য, কেহ কেহ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হন, ও মানব দেহ ধারণ করিয়া দেবভাবের অভিনয় করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহা-দিগের সংখ্যা এতই বিরল যে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি

হয় না। কিন্তু এরূপ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকেই দুই এক বৎসর যোগী থাকিয়া বাঞ্ছিত সুখলাভে নিরাশ হইয়া পুনর্ব্বার গৃহী হইতে বাসনা করেন। প্রভো! সুখ না অলীক বস্তু কেবল ছায়ামাত্র। তবে ইহারা জ্ঞানী হইয়া অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন হইতে চান কেন? সেই আনন্দময়ের শ্রীচরণ কমলে মতি অর্পণ করিলে, অতুলানন্দ লাভ ও জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে ভাবিয়া, কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করা ও তাঁহাকে না ভাবিয়া আমোদ প্রমোদে মন নিবিষ্ট করা, এই উভয়-বিধ কার্য্যই কি অজ্ঞান তিমির প্রসূত নহে? কারণ, ইহারা কেবলমাত্র সুখান্বেষী, ইহাদিগের কর্ত্তব্য বোধ অতীব অল্প। তিমির দূর করিতে গিয়া তাঁহারা তাহাতেই আবৃত হইয়া পড়েন। মধ্যে মধ্যে অনুতাপরূপ ক্ষীণালোক দেখিলেন, মনে বিশ্বাস হইল যে, সুখরবি আর তাঁহাদের জীবনাকাশে উদিত হইবে না। আবার পরক্ষণেই দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের অপেক্ষাও অধম জীব জগতে বর্ত্তমান আছে, যখন পরম পিতার দয়া তাহার প্রতি সম্ভবে, তখন তিনি কেননা আমাদের প্রতি দয়া করিবেন? এইরূপে মানবগণের অন্তঃকরণ কখন কোন্ পথে প্রধাবিত হয়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রভো! দয়া করিয়া এই বিষম সংশয়ের অপনোদন করুন।

গুরু। বৎস! অদ্য সুপ্রভাত। তোমার এতাদৃশ ভাব দর্শনে আমি যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়াছি। এক দিনের বারিধারায় এত শস্য জন্মিবে, ইহা স্বপ্নেও অনুমিত হয় নাই। বৎস! অদ্য আমার এক বিষম ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে, পূর্ব্বে মনে করিতাম, আমি লোক চিনি; কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া অদ্য সে ভ্রম দূরে গিয়াছে। যতদিনই কেন একজনের সহিত একত্র বাস করা যাউক না, ব্যবহার করা যাউক না, তাঁহাকে চিনিতে পারা অতীব দুরূহ। কারণ, কাহার যে কখন কি ভাব উপস্থিত হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। জীব কাল ও ঘটনার অধীন। আজ যিনি জগতে দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া পরোপকার-প্রভৃতি জগতের হিত সাধন করিয়া জন-সাধারণের নিকট উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন ও তাঁহা-দিগের নিকট প্রশংসাভাজন হইয়াছেন; দু'দিন পরে ঘটনার কুটিলচক্রে পতিত হইয়া তিনি অতীব নীচান্তঃ-করণের পরিচয় দিয়া সকলের নিকট কুৎসা ভাজন হন। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাল জগৎ সংসারে মহাযন্ত্র ও ঘটনা ইহার অপূর্ব্ব চালক। কাল স্বকীয়

অপূর্ব্ব চালক দ্বারা চালিত হইয়া জগতে অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সকল সম্পাদিত করিতেছে। আজ যাহা বিস্তীর্ণ বালুকাপূর্ণ মরুভূমি, কিছুকাল পূর্ব্বে তাহা ভীষণ মহাসমুদ্র ছিল; আজ যাহা জনমানবপূর্ণ প্রাসাদ কুটির সুশোভিত বিস্তীর্ণ নগর, কিছুদিন পূর্ব্বে তাহা ভীষণ নিবিড় অটবী ছিল। কালের করালচক্র কুটিল। জগতে যাহা আছে, তাহা চিরকাল ছিল ও থাকিবেক। কিন্তু কত যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বৎস! এক্ষণে সাধ্যমত তোমার প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। কারণ, বিষয়টা অতীব গুরুতর। বিশ্ববিভুর বিশ্ববিমোহিনী শক্তির দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি। এই শক্তির নাম প্রকৃতি। ইহা সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণময়ী ও ইহাদের সাম্যাবস্থা। দয়া, দাক্ষিণ্য, মানসিক প্রফুল্লতা প্রভৃতি সত্ত্বগুণের কার্য্য। উত্তেজনা, প্রেরণা বা কার্য্যোন্মুখ করা রজোগুণের কার্য্য। রাগ, দ্বেষ, আলস্য, মোহ প্রভৃতি তমোগুণের কার্য্য। অল্প কথায় সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক, রজোগুণ চেষ্টাত্মক ও তমোগুণ প্রতিবন্ধাত্মক। শব্দ যেরূপ আধার ব্যতীত অনুমিত হয় না, আত্মাও জীবদেহরূপে আধার ব্যতীত উদ্ভাসিত হয় না। শব্দ যেরূপ সেতার, মৃদঙ্গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন

ভিন্নরূপে প্রতিধ্বনিত হয়, এবং দুইটী সেতার বা দুইটী মৃদঙ্গ হইতে উপাদান-বিশেষে প্রায়ই একরূপ শব্দ নির্গত হয় না, তদ্রূপ আত্মা জীবদেহরূপ ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্নরূপে উদ্ভাসিত হয়, এবং দুইটী এক শ্রেণীভুক্ত বা অপর দুইটী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত জীবের সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের তারতম্য হেতু প্রকৃতি একরূপ হয় না।

প্রকৃতির দুই প্রকার শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ শক্তিবলে পরমাত্মা ঈশ্বর মানবের দুর্জ্ঞেয় হইয়া রহিয়াছেন, আর বিক্ষেপ শক্তিবলে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। কারণ, বিক্ষেপ শক্তির অবর্ত্তমানে পুরুষ কর্ম্ম ফল ভোগ করিতেন না। কর্ম্মফলের নিমিত্তই পুরুষের দেহান্তর প্রাপ্তি হয়, নচেৎ জীবাত্মা পুরুষ সর্ব্বদাই পরমাত্মায় লীন থাকিত, সৃষ্টি অসম্ভব হইত। পুরুষ যদি বিক্ষেপ শক্তির বশীভূত না হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব আপনায় আরোপ না করিয়া আসঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া সমুদায় স্বয়ং ঈশ্বর পরমাত্মায় অর্পণ করিত, তাহা হইলে জীবকে শুভা-শুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইত না। পরমারাধ্য পরম পিতা সকল কার্য্যের নিয়ন্তা, আমরা কেবল হেতু মাত্র। কিন্তু বৎস! ইহা বলিয়া এরূপ আশঙ্কা করিও না যে, পুরুষকার কিছুই নহে; যে হেতু ঈশ্বরই পুরুষকার

রূপে পরিণত হয়েন। সর্ব্বত্রই পুরুষকার প্রধান, কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের নিয়ামকত্ব অন্যথা হয় না। বৎস! অর্ণবযান চালাইতে হইলে, চালক যেরূপ অগ্নি ও জল ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করেন, সেইরূপ পরম পিতা নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিতি করিয়াও পুরুষকারের সহায়তা গ্রহণ করেন। আরও পূর্ব্বোক্তরূপ আসঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া সমস্ত ঈশ্বরে অর্পণ না করিলে জীবের মুক্তি সম্ভবে না—ইহা জ্ঞান ও কর্ম্ম সাপেক্ষ। কামবিহ্বলা বারাঙ্গনা যেরূপ কাম ও অর্থ লালসা পরিতৃপ্তি করিবার মানসে নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মানবগণের চিত্ত হরণ করে ও তাহাদিগকে কুপথগামী করে, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষের প্রীতিসাধনার্থে পৃথিবীস্থ বস্তুকে নানা বেশভূষায় ভূষিত করিয়া প্রতিনিয়ত ভোগদান করেন ও কুপথগামী করেন। পুরুষ প্রকৃতির মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গম বাসনা করেন। এই স্পৃহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, প্রকৃতিও পুরুষকে ততই আয়ত্তাধীন করেন। এই ভোগ স্পৃহায় এত অপরিমেয় আশা হয় যে, প্রকৃতি যতই কেন ভোগদান করুন্ না, কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হয় না। এই মরীচিকাময়ী আশাই অমঙ্গলকর। লোকে ইহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া দুঃখ ভোগ করেন। সকলেরই সীমা

আছে। সীমা অতিক্রম কর, আবার যে স্থানে ছিলে, সেই স্থানে আসিয়া পড়িবে। এইরূপে লোকে আশা করে, নিরাশ হয়; আবার আশা করে, আবার নৈরাশ্যে পতিত হয়। এইরূপে শেষে যখন নৈরাশ্য সাগরে ভাসিতে থাকে, তখন লোকে শান্তিলাভ করিতে চেষ্টা করে, প্রকৃতির ভোগে বিরত হয়, তখন প্রকৃতিও ভোগদানে নিরস্ত হন; তখনই লোকের ঘোর ভাঙ্গে, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ভাবিতে যত্নশীল হয়। কিন্তু ইহা স্বল্পায়াস-সাধ্য কার্য্য নহে, এবং সকলের এইরূপ মতিও হয় না। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার ও প্রকৃতি অনুসারে লোকের মতিগতি ভিন্ন, রুচি ভিন্ন। ঈশ্বর আরাধনায় মনের একাগ্রতার বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু মন স্বভাবতঃ চঞ্চল; ইহাকে আয়ত্তাধীন করিতে না পারিয়া লোকে পুনরায় প্রকৃতির ভোগে রত হয়। এইরূপে বহুজন্ম ভ্রমণ করতঃ জীবের এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর প্রকৃতির ভোগে পূর্ব্ববৎ কিঞ্চিৎ মাত্র তৃপ্তিলাভ হয় না, বরং বিরক্তি জন্মে, পুরুষ তখন আপনার কার্য্যে আপনি নিযুক্ত হন। ভগবৎ কৃপায় ও সদ্‌গুরুর উপদেশ বলে জীব শেষে মুক্ত হয়। কর্ম্মের অবসানেই জীবের মুক্তি।

বৎস! পরম পিতা সর্ব্বব্যাপী ও প্রকৃতির কার্য্য সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু মানব প্রকৃতির বিশ্ববিমোহিনী শক্তি-

হৃদয়ের বশীভূত হইয়া, ইহা অনুভব করিতে পারেন না। বৎস! যিনি অনাদি নাথকে সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান দেখিতে পান, সেই ভাগ্যবান্ই সর্ব্বতোভাবে অনুভব করিতে পারেন যে, তিনি সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার সর্ব্বস্থান ব্যাপকতা মানবের স্ব স্ব জ্ঞান ও কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। পরম পিতাকে আপন হৃদয়ে বর্ত্তমান দেখিতে পান, এরূপ লোকই নয়নগোচর হওয়া যখন দুরূহ, তখন সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান দেখিবেন, এরূপ লোক নাই বলিলেও নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হয় না। কোন ভাগ্যবান্ মহাত্মা তাঁহাকে সর্ব্ব-স্থানে সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তোমার আমার ন্যায় ব্যক্তির শাস্ত্রে ও দশজনার কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করা ব্যতিরেকে আর কিছুই সম্ভবে না। আর যদি তুমি একাগ্রচিত্তে তাঁহার শ্রীচরণকমলে মতি অর্পণ করিতে পার, এবং আসঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম সমূহের ফল তাঁহাতে অর্পণ করিতে সক্ষম হও, তবে স্বয়ং ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবে। কার্য্য না করিলে, এ সকল গুরুতর বিষয়ের চাক্ষুষিক প্রমাণ দেখান নিতান্ত অসম্ভব।

এই সংসার আমাদিগের কর্ম্মভূমি। যিনি যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি সেইরূপ ফলভোগ করিবেন।

লোকে মনে করেন যে, গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই, ঈশ্বর প্রাপ্তি স্বল্পায়াস-সাধ্য ও সম্ভবপর; কিন্তু ইহা যে বিষম ভ্রম, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। জগতে কি তুমি এরূপ দেখিয়াছ যে, যিনি শৈশবাবস্থা অতিক্রম না করিয়া একেবারে প্রৌঢ়, যিনি শৈশবাবস্থায় "মা" এই একটীমাত্র শব্দ উচ্চারণ না করিয়া একেবারে শব্দ সাগর আয়ত্তাধীন করিয়াছেন, ও যিনি জগতের শ্রেষ্ঠ গুরু পিতা মাতা, প্রাণের প্রতিমা পত্নী ও হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধক নন্দন, ইহাদিগকে প্রাণের সহিত ভাল না বাসিয়া ভালবাসা ও প্রেম কি বস্তু জানিতে পারিয়াছেন? ইহা যেরূপ অসম্ভব, তদ্রূপ সংসারাশ্রম ঘৃণা বা অন্য কোন কারণ বশতঃ ঘটনা স্রোতে পরিত্যাগ করিয়া যে কোন২ আশ্রম গ্রহণ করা যাউক না, তাহাতে ইষ্টসিদ্ধির আশা অতীব অল্প। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রে এরূপও দৃষ্ট হয় যে, যাঁহারা অধিক দিন জননীর লালনে লালিত ও জনকের শাসনে শাসিত হন নাই, অথবা সন্তানের প্রতি তাঁহাদের কি অনির্ব্বচনীয় স্নেহ মমতা দৃষ্টান্ত দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, যাঁহারা কান্তাধরে মধুরিমা আস্বাদন করিতে পারেন নাই, অথবা প্রণয়িনীসহ পবিত্র বিশ্রব্ধ প্রেমালাপে সুখানুভব করেন

নাই, এবং যাঁহারা কখন আনন্দমূর্ত্তি আত্মজের অর্দ্ধস্ফুট বচন শ্রবণে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করেন নাই, সেই বিজন কাননবাসী আবাল যোগীরাও যদি কখনও কোন কারণ বশতঃ ক্ষণকাল সাংসারিক ঘটনা অবলোকন বা অনুধ্যান করেন, তবেই অমনি তাঁহারা যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। কিন্তু যিনি সংসারী হইয়া স্বকীয় বন্ধুস্বজন পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য ব্যবহারে পরাঙ্মুখ নহেন, যিনি ক্ষমা, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি স্বর্গীয় গুণরাশিতে বিভূষিত এবং যাঁহার হৃদয়ে প্রেম, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার তরণী তর তর বেগে প্রবাহিত হয়, ও ভীষণ বাত্যাকুলিত তরঙ্গ মালায়ও তরণী স্থিরতর ভাবে অবস্থিতি করে, কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত হয় না, সেই মহাত্মা যে পথই অবলম্বন করুন না, তাহাতেই তাঁহার অতি অল্প আয়াসেই ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা। এই নিমিত্তই পুরাকালীন পূর্ব্বপুরুষেরা প্রথমে সংসারী হইয়া বিশিষ্ট সদসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, পরে মনকে দৃঢ় করিয়া উপযুক্ত প্রিয়জনের উপর সংসার ভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং জীবনের অবশিষ্টভাগ ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। সংসারের কার্য্য সকল পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাদিগের যথার্থ বৈরাগ্যের উদয় হইত। বৈরাগ্যোদয় হইলেই ইষ্ট-সিদ্ধির পথ অতীব সরল। কিন্তু বৎস! এক্ষণে বৈরাগ্য

কেবলমাত্র সংজ্ঞাসূচক হইয়া পড়িয়াছে, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে! আজ কাল যিনি যে বিষয়ে অধিকারী নহেন, তিনিই সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, অবশেষে কঠিন বলিয়া ভগ্ন হৃদয়ে তাহার আলোচনায় বিরত হন। কিন্তু তিনি যদি অধ্যবসায়শালী হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র শ্রম ও ধৈর্য্য স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে কিছু দিন পরে উহা অবশ্যই তাঁহার বোধগম্য হইত। অধ্যবসায়ই উন্নতির সোপান। এইরূপে লোকে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া অসময়ে ফলকে বৃন্তচ্যুত করিয়া সুরস গ্রহণে বঞ্চিত হন। বারিশূন্য মরুভূমিতে যেরূপ তৃষাকুল মৃগগণ বারিপান লালসায় মরীচিকার পশ্চাৎবর্ত্তী হয়, সেইরূপ লোকে ইন্দ্রিয় নিগ্রহের প্রধান স্থান সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় বিকারের হেতু-শূন্য বিজন কাননে বাস করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু মরীচিকানুবর্ত্তী মৃগগণের ন্যায় তাহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় না। একে মন স্বভাবতঃ সাতিশয় চঞ্চল, তাহাতে আবার কাম ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুবর্গ অনুক্ষণ উহাকে কুপথে লইয়া যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে, নীচাশয়তা স্বার্থপরতা পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সমুদায় পরোপকারিতা উদারতা সহানুভূতি

প্রভৃতি সুপ্রবৃত্তি নিচয়কে আবির্ভূত হইতে দেয় না; সুতরাং মন সদ্যোধৃত মদমত্ত আরণ্য গজের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় ও উন্মার্গগামী হইয়া উঠে, কিছুতেই উহাকে বশীভূত করা যায় না। ইহা কোন কথা বা ইঙ্গিত বুঝে না, কোন কার্য্যই ইহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয় না, মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন ঃ—

"বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।"

বিকারের হেতু সত্ত্বেও যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত না হয়, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানী। সংসারে নানাপ্রকার প্রলোভনের সামগ্রী বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তথায় বাস করিয়াও সেই সকল প্রলোভনে আমাদিগের অন্তঃকরণ যদি বিমুগ্ধ না হয়, তবেই যথার্থ মনকে বশীভূত করা হইল। মায়াকুহকিনী কুহকজাল বিস্তার করিয়া সংসারকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা ভেদ করা কঠিন ব্যাপার সত্য বটে; কিন্তু যদি সদ্‌গুরুর উপদেশে উপদিষ্ট হইয়া কেবলমাত্র বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, সংসারাশ্রমই ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রধান সাধন ও সরল পথ। বৎস! এই সংসার কর্ম্ম-ক্ষেত্র; ইহা কেবল প্রাক্তন কর্ম্ম ফল ভোগ করিবার

স্থান নহে। আমরা ইহলোকে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সদসৎ কর্ম্মের পুরস্কার ও দণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্তু এই উভয়ই চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত। যখন আমরা জন্মান্তরীন সুকৃতিবলে সাংসারিক সুখ ভোগ করি, তখন যেন বিস্মৃত হই না যে, এই সৌভাগ্য আমাদিগের কিয়ৎ-পরিমাণে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সামান্য পুরস্কার মাত্র। আমরা এখন সমুদায় কার্য্য করিয়া উঠিতে পারি নাই, আরও কর্ম্ম করিতে হইবে। কারণ, কর্ম্মের অবসানে জীবের মুক্তি। পুনর্ব্বার যখন পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতির ফল স্বরূপ বিবিধ ক্লেশ-পরম্পরা ভোগ করিতে থাকি, তখন ইহা আমাদের অসদ্ অনুষ্ঠানের দণ্ড মনে রাখা আবশ্যক। কারণ, আমরা পূর্ব্বোক্তরূপ ধারণা করিতে সক্ষম হইলে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগকালীন দুষ্কৃতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত থাকিব; ক্রমশঃ ভার লঘু হইয়া আসিতে লাগিল, পরমপদ প্রাপ্তির আশা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আশু-ফল-লাভে ব্যস্ত হওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু যদি আমরা পুরস্কার ও দণ্ডের মর্ম্ম সম্যক্ অবগত হইতে না পারিয়া সুখের সময়ে গর্ব্বিত ও বিষয় ভোগে অনুরক্ত থাকিয়া পরমপদ ভুলিয়া থাকি, এবং দুঃখের সময়ে ক্ষুব্ধ হইয়া অসৎ পথ অবলম্বনে বিরত না হইয়া

অসদুপায়ে মনের শান্তিলাভ করিতে প্রয়াস করি, ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন না হইয়া কেবলমাত্র স্বার্থ সুখলাভে ও স্বোদর পূরণে যত্নবান্ হই, তবেই আমরা চিরদিনের জন্য নষ্ট হইলাম। দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়াও নষ্ট করিলাম, যথার্থ ব্যবহার করিতে পারিলাম না, ইহাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি সম্ভবে? সংসারে মানব মাত্রেরই কার্য্যে দুইটী উদ্দেশ্য বর্ত্তমান আছে, মুখ্য ও গৌণ। যদি মানবের ঈশ্বর প্রাপ্তিই মুখ্য ও সংসারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করা গৌণ উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অভীষ্টসিদ্ধির পথ অতীব সরল। এইরূপে এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে তুমি যে কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও, তাহার কৃতকার্য্যতাকে গৌণ ও পরমপদ প্রাপ্তিকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া কার্য্য কর, তাহা হইলে কুপ্রবৃত্তি নিচয়কে ও দুর্দ্দমনীয় ষড়্রিপুকে দমন করিতে সক্ষম হইবে। যদি তুমি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে, তবে তুমি যাহা করিতে প্রয়াস পাইবে, তাহাই সম্ভবপর হইবে। ইহা সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিও না। ইহা মহা সাধনা সাপেক্ষ। ইহা নিভৃত গুহাবাসী যোগীর যোগসাধনা অপেক্ষা সহস্রগুণে গুরুতর ও কঠিন।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৃত মহাভারতে প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের চরিত্র পাঠ করিলে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে,

তিনি কেবল একমাত্র বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে এই পূর্ব্বোক্ত সাধনায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। পরশ্রীকাতর ঈর্ষাপরবশ দুর্ব্বৃত্ত দুর্য্যোধন, পাণ্ডবদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ ও তাঁহা-দিগকে অপমানিত করিবার মানসে যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যূত ক্রীড়ায় আহ্বান করিলে, তিনি সরল হৃদয়ে আপনার সমস্ত সম্পত্তি ও পাঞ্চালীকে পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। যখন দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভাতলে আনয়ন করতঃ সর্ব্বজন সমক্ষে বস্ত্রহরণ আরম্ভ করিয়াছিল, তখন অজাত শত্রু যুধিষ্ঠির কেবলমাত্র লজ্জায় অধোবদন হইয়া বসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাতে কোনরূপ ক্রোধের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই। ঈদৃশ দারুণ অত্যাচার দর্শনে তাঁহার মহাবলশালী ভ্রাতৃগণ ক্রোধান্ধ হইয়া অনিমেষ লোচনে যথাযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠের আদেশ অনুক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠ অমানুষিক শক্তিবলে স্থির চিত্তে উপবেশন করিয়া রহিলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির স্বয়ং কাপুরুষ ছিলেন না, এবং স্বীয় ভ্রাতৃগণের অমানুষিক বলবীর্য্যের বিষয়ও অবিদিত ছিলেন না; কিন্তু কেবলমাত্র সত্য-রক্ষার অনুরোধে অচল অটল ভাবে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। প্রণয়িনীর প্রতি এরূপ ভীষণ অত্যাচার করিতে

দেখিলে, কোন্ মানবের না, ধৈর্য্যচ্যুতি হয়? এতদ্ভিন্ন সমুচিত প্রতিফলদানে সক্ষম হইয়াও, কোন্ মানব তখন সত্য পালন করিবার নিমিত্ত নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিতে পারেন? যখন দুর্য্যোধন, স্বীয় ঐশ্বর্য্য ও বলবীর্য্য প্রদর্শনে বনবাসী পাণ্ডব ভ্রাতৃগণকে মর্ম্মাহত করণ মানসে ঘোষ-যাত্রায় বহির্গত হইয়া, আত্মীয় বন্ধু পরিজনবর্গের সহিত চিত্ররথের হস্তে নিগৃহীত হন, তখন তাঁহার বিপদে যুধিষ্ঠির স্বীয় অন্য ভ্রাতৃগণের ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দিত না হইয়া, সেই পাপাত্মাকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এরূপ প্রতিহিংসা-শূন্যতা কি সামান্য সাধনায় সম্ভবে? যখন মহাত্মা স্বর্গদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া আশ্রিত কুক্কুরকে পরিত্যাগ করা অপেক্ষা, স্বর্গসুখ পরিত্যাগই শ্রেয়ঃ, স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তখন তিনি কি অসাধারণ উচ্চান্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ইহাই নহে, ইহা অপেক্ষা গুরুতর ঘটনা সমূহেও তিনি যে, কর্ত্তব্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হন নাই, তাহার সমূহ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মহাত্মা যুধিষ্ঠির বহু ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়াও আজীবন সত্য ও দয়া হইতে বিমুখ হন নাই। এই উভয়ই তাঁহার অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ সর্ব্বদাই তাঁহাতে বিদ্যমান থাকিত। সত্য ও

দয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মূলভিত্তি। জগতে কত প্রকার লোক বিদ্যমান আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যত প্রকার লোক, তত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে; কিন্তু এমন কোন ধর্ম্ম বিদ্যমান নাই যে, দয়া ও সত্য সেই ধর্ম্মের মূলভিত্তি নহে। পর্ব্বত নিবাসী মানবপশু গারো, কুকী প্রভৃতি অসভ্য জাতিরাও অত্যন্ত সত্যপ্রিয় ও স্ব স্ব জ্ঞান ও সভ্যতানুযায়ী দয়াশীল। যখন দয়া ও সত্য ঈদৃশ অসভ্য জাতির ধর্ম্মের অন্তর্ভূত; তখন ইহাদের অপেক্ষা সভ্যতাপ্রিয় জাতিরাও যে, সত্য ও দয়াকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন; ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সত্য ও দয়া বিরহিত মানব, যদি শত শত অন্যান্য সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তবে তাহা কেবলমাত্র ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করা হয়। জীবমাত্রেই স্বার্থপর। এই বিষম স্বার্থপরতার অনুরোধেই মানব সত্য ও দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি যথাযথ অনুশীলনে নিতান্ত অক্ষম। জীব যতদিন স্বার্থান্ধ হইয়া থাকেন, ততদিন নিষ্ঠুরতাকে দয়া, মিথ্যাকে সত্য, পরাপকারিতাকে পরোপকারিতা জ্ঞান করেন। এই মহৎ রোগের একমাত্র অমোঘ ঔষধ জীবে আত্ম জ্ঞান। স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করা, মানবমাত্রেরই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু সময়ে স্বার্থত্যাগও

মূর্খতা। যেখানে স্বার্থত্যাগ, দুষ্টের অসদ্ অভিসন্ধির প্রশ্রয় প্রদান করা হয়, সেইখানেই স্বার্থত্যাগ অনিষ্ট-কারক। অল্প কথায়, স্বার্থকে ধর্ম্মের অনুগতি অর্থাৎ দয়া এবং সত্যের অনুগত করাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তি-সঙ্গত। আমাদিগের জীবন নানাপ্রকার নানারঙ্গের ঘটনায় জড়িত। তৎসমুদায় উপস্থিতকালে কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যুক্তি-সিদ্ধ এবং কোন্ কর্ম্ম করা অযৌক্তিক ও অকর্ত্তব্য, ইহা স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে, অবশেষে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে অনুতপ্ত হইতে হয় না। মানব আপনার অপেক্ষা জ্ঞান ও প্রখর বুদ্ধি-শালী ব্যক্তিদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য অনায়াসে বিচার করিয়া লইতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র কোন্ কার্য্য করিলে পুণ্য সঞ্চয় ও পাপ সংস্পর্শ হইবে, এইরূপ আন্দোলন করিয়া জীবনের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করেন। সকলেরই যুধি-ষ্ঠিরের ন্যায় হওয়া অসম্ভব। কিন্তু ইহা বলিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে বিরত থাকা উচিত নহে। বিন্দু বিন্দু জল কণিকা অতিশয় কঠিন পাষাণেও সতত পতিত হইলে যেরূপ তাহাকে ভেদ করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরাদি মহাত্মাগণের সতত অনুসরণ করিতে চেষ্টা

করিলে, দুঃসাধ্য কার্য্য সকল সুসাধ্য হয়। সংসারে দুঃসহ কষ্ট সমূহ ভেদ করিতে পারা যায়।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিষ্য। প্রভো! যাহা বলিলেন, তাহা প্রায়ই সমস্ত বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা কেন আবার সন্দেহময় দেখিতেছি? ভাবিয়াছিলাম, আপনার উত্তরে আর সন্দেহ থাকিবেক না; সকলই মীমাংসা হইয়া যাইবেক। কিন্তু দেব! এরূপ হইল কেন?

গুরু। বৎস! ইহা মনের কার্য্য, তোমার দোষ নাই। সকলের মন একরূপ নহে, এবং সকল সময়েই ইহা একরূপ থাকে না। এই নিমিত্তই সন্দেহরাশি সমুদ্ভূত হইয়া মনকে আলোড়িত করে। জগতে এক বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন মানবের নিকট ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া তাহাদিগকে সন্দিগ্ধ করে। কল্পনা মনের আশ্রয় স্থান ভাগী। কল্পনা বলে, কেহ সুরম্য অটবীকে

সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদিগের বিহারের নিমিত্ত, কেহ ইহাকে স্বভাবের বিচিত্র শোভা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, জগৎপাতা জগদীশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, জ্ঞান করেন। পরম পিতা পরমেশ্বর কোন্ বস্তু কি কারণে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জানিতে প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; কারণ, তিনি জ্ঞানাতীত। সকল বস্তুরই সীমা আছে। আমাদিগের জ্ঞানের ও সীমা আছে, কিন্তু আমরা প্রগল্ভতা বশতঃ জগতীস্থ সৃষ্ট বস্তু নিচয়ের কার্য্য-কারণ বুঝিতে গিয়া বিষম সন্দেহজালে জড়িত হই। আবার ঘটনার অপূর্ব্ব কৌশলে আমাদের যথার্থ মণিতে ভ্রম হয়, কিন্তু আবার ইহার জ্যোতির তুলনায় প্রজ্জ্বলিত দীপে মণি বলিয়া ভ্রম হয়। যথার্থ জ্ঞানী জ্ঞানবানের ন্যায় কার্য্য করিলেও মূর্খ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আর তাঁহার তুলনায় সামান্য ব্যক্তিকেও বিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ আমাদের সমক্ষে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। ইউরোপের ওয়াটারলুর যুদ্ধে পৃথিবীর অদ্বিতীয় বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি সামান্য সার্ আর্থর্ ওয়েলেস্লির নিকট পরাজিত হইলেন, অমনি ওয়েলেস্লি জগতের অদ্বিতীয় যোদ্ধা ডিউক্ অফ্ ওয়েলিংটন বলিয়া সমাদৃত হইলেন। যিনি অদ্বিতীয় বীর ছিলেন,

যাঁহার অসীম সাহসে ও যুদ্ধ কৌশলে এককালে সমগ্র বসুন্ধরা ভয়ে কম্পমান ছিল, যিনি প্রায়ই পরাজয় স্বীকার করেন নাই বলিয়া, দিগ্বিজয়ী নামে খ্যাত ছিলেন; তিনি আজ ঘটনা চক্রে সামান্য যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী বলিয়া মূর্খ। আর যিনি অর্থলাভ লালসায় স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া জীবনের মায়া মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া ভারতে আসিয়াছিলেন, তিনি সময়ের স্রোতে ভাসিয়া গিয়া ওয়াটারলুর যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন বলিয়া মহাযুদ্ধকুশলী ও বুদ্ধিমান্। কাল তুমি ধন্য! ধন্য তোমার লহরী! ঘটনা ধন্য তোমার কার্য্য-কৌশল! যিনি যথার্থ অদ্বিতীয় বীর, যিনি অধীনতাকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতেন, যাঁহার যুদ্ধ-কৌশল আজ পর্য্যন্তও সমর জগতে আদর্শ বলিয়া পরিগণিত, তাঁহাকেই তুমি আবার মূর্খ বলিয়া আমাদিগকে সন্দিগ্ধ করিতেছ। কাল! তোমারই বিচিত্র গতিতে রুচিরও বিভিন্নতা ঘটে। যাহা শৈশবে ভাল লাগে, তাহা যৌবনে ঘৃণার সামগ্রী। বালকবালিকা খেলা ভালবাসে, ধূলি মাখিতে ভালবাসে, যৌবনে কিন্তু তাহাদের সে ভাব থাকে না—সেই ধূলি-খেলাই পরম ঘৃণাস্পদ কার্য্য। কণামাত্র ধূলি স্পর্শ ভয়ে যুবক যুবতী ব্যস্ত; কিন্তু ধূলি ‘‘টলে বিভূষিত হইয়াও

বালকবালিকা আনন্দ সাগরে নিমগ্ন। কিন্তু আবার এ কি আশ্চর্য্য! ঘটনার দ্বারা কালের স্বভাব বিরুদ্ধ কার্য্য সমুদায়ও অবলীলাক্রমে সম্পাদিত হয়। যে বার্দ্ধক্যে যৌবন-সুলভ স্বভাবকে চপলতা ও অপরিণামদর্শিতা পরিপূর্ণ দেখেন, সেই বার্দ্ধক্যেই ঘটনাবশে মানবের কেবলই চেষ্টা হয় যে, কি করিলে যৌবন প্রত্যাগমন করে, কি করিলে যৌবনকালীন সৌন্দর্য্য পুনর্ব্বার পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু হায়! যৌবন কি ফেরে? যাহা একবার যায়, তাহা কি আর প্রত্যাগমন করে? আশাদেবী কেবল স্বীয় মোহকরী শক্তি বিস্তার করিয়া মানবগণকে আশ্বস্ত করেন মাত্র। জগৎ যদি আশা শূন্য হইত, তবে তাহা মানব শূন্য হইত। আশাই মানবের প্রাণ-বায়ু স্বরূপ ও সুখ দুঃখের হেতু। আশাদেবীর করুণাবলেই যৌবন ফিরিতেছে, তাঁহার এরূপ বোধ হয়। কিন্তু যৌবন ফেরে নাই—ফিরিয়াছে কেবল যৌবনের বিষম ঘোর—সৌন্দর্য্যের উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে; মন স্বর্গের সুষমা ধরিতে দৌড়িতেছে—শুষ্ক অধরে রক্তিমরাগ বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপে দৃষ্ট হয় যে, ঘটনার দ্বারা অলীক সন্দেহ সমূহ সমুপস্থিত হয়। মায়াই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দুর্ঘট ঘটনা সমুহ সম্পাদিত করিতে

সততই বাসনা করেন; অতঃপর মায়াই সন্দেহের মূল কারণ। এতদ্ভিন্ন মন আন্তরিক ব্যাপারে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন; কিন্তু বাহ্যিক ব্যাপারে ইন্দ্রিয়গণের অধীন। মনে মনে আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাবিতে পারি, তাহাতে ইন্দ্রিয়গণের সহায়তার কোন প্রয়োজন হয় না; কিন্তু মনে মনে কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে বাসনা করিলে, অথবা কোথায় গমনোৎসুক হইলে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য ব্যতিরেকে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না। অতএব বৎস! তুমি যদি সর্ব্বদাই সীমাধিক কারণ অনুসন্ধিৎসু হও, তাহা হইলে সন্দেহ পতাকাবৎ অগ্রে অগ্রে গমন করিবেক। কিন্তু যদি তুমি মনকে অল্প কারণে বিচলিত না কর, বৃথা আশার কৌতুকে মুগ্ধ না হও, তাহা হইলে সন্দেহ তোমার সমীপে অগ্রসর হইতে পারিবেক না। এতদ্ভিন্ন আমরা কুতর্কের অনুসরণ করিয়া সন্দেহ সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গমালায় কিছুই স্থির করিতে পারি না। এই নিমিত্তই দূরদর্শী কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।" কিন্তু অহো কি দুরদৃষ্ট! অধুনাতন কৃতবিদ্য মহোদয়গণ আমাদিগের প্রাচীন দূরদর্শী মহোদয়-গণের উক্তির প্রতি কোথায় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেন, না প্রায়ই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। দেব দেবী পূজা

পরায়ণ ব্যক্তিগণকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুরোধে পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী মূঢ় বলিয়া ঘৃণা করেন, আর্য্য মুনিঋষিগণ কৃত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকাণ্ডকে "মরা গরুতে ঘাষ খায়?" প্রভৃতি উক্তি দ্বারা উপেক্ষা করিয়া থাকেন, এবং প্রাচীন প্রচলিত প্রথা সমূহের আমূল পরিবর্ত্তনে সততই যত্নবান্ হইয়া মনে করেন, স্বদেশের পরম হিত সাধন করিতেছেন। কিন্তু হায়! তাঁহারা হিত কি অহিত সাধনে বিব্রত, তাহা তাঁহারাই জানেন! তাঁহারা ভাবেন যে, ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহা জ্ঞাতব্য, তৎসমুদায়ই অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের অজ্ঞাত ও শিক্ষিতব্য আর কিছুই নাই; তাঁহাদের এই বিশ্বাস অচল অটলভাবে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু বৎস! তুমি ইহা অবধারিত জানিও যে, অবনীমণ্ডলে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের নিকটেও শিক্ষা করিবার বিষয় আছে এবং আজীবন অধ্যবসায়শীল হইলেও শিক্ষা সমুদ্রের অপর তীরে উত্তীর্ণ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। এই নিমিত্তই দূরদর্শী মহাত্মারা বলিয়া থাকেন যে, বিশ্বাসই মুলাধার; এই নিমিত্তই তাঁহারা তাঁহাদের আজীবন সঞ্চিত শিক্ষা ও জ্ঞান অপরকে উপদেশচ্ছলে প্রদান করিতেন। তুমি যদি তাহাদের উপদেশ সমূহকে ভিত্তি না করিয়া স্বয়ং স্বীয় ভিত্তি নির্ম্মাণে উদ্যত হও,' তাহা

হইলে আজীবন শুদ্ধ কেবল তাহাতেই অতিবাহিত হইবে, ভিত্তি নির্ম্মাণে জীবন চলিয়া গেল; কিন্তু বাটী প্রস্তুত করা আর হইল না; ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? তাঁহাদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিলে জটিল বিষয়ও সরল হইয়া যায়। বিশ্বাস ব্যতিরেকে সন্দেহ দূর করা অতীব অসম্ভব। কারণ, তুমি যাহাকে সত্য বলিয়া জ্ঞান কর, তাহাই অপরের চক্ষে ভ্রমপূর্ণ। তুমি বহু কষ্টে ও যত্নে তাহার সেই বিশ্বাসকে ভ্রমসঙ্কুল প্রমাণ করিলে, কিন্তু দু'দিন পরে যোগ্য সময়ে একজনের একটী কথার ভরে তোমার বহু যত্ন সম্ভূত কার্য্য বিফল হইল—তোমার কথায় অবিশ্বাস জন্মিল। তুমি যাহা ভাঙ্গিলে, অপরে তাহা গড়িল; এইরূপে তোমাদের ভাঙ্গা গড়ায় ক্ষতি আছে, লাভ নাই—লোকে সন্দেহের ভীষণ সমুদ্রে অর্দ্ধ মৃতবৎ ভাসিতে থাকে। হায়! আবার কেহ কেহ স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি ও কার্য্য কৌশলে অপরের বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া আপন মতাবলম্বী করিবার নিমিত্ত প্রলোভন পর্য্যন্তও প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা কি ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিচায়ক নহে? এই নিমিত্তই সকলের কথায় বিশ্বাস না করিয়া সাধুচেতা দূরদর্শী মহাত্মাদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করা

মানব মাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে সন্দেহ অসম্ভব।

জগৎ পাঁচ ফুলের সাজি। করুণাময় পরমেশ্বর সকলকে সকল রত্ন প্রদান করেন নাই; তিনি ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন রত্ন স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য একজন একজনের সহায়তা করে। কিন্তু তুমি যদি স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য কর, তবে তোমার সহিত ইতর জীবের প্রভেদ কি? জ্ঞান অসমুদ্র সম্ভূত রত্ন। এই অমূল্য রত্ন ভাগ্যক্রমে লাভ করিয়া অহঙ্কারের গভীরতম গুহায় লুক্কায়িত রাখিতে প্রয়াস পাওয়া কি যথার্থ মনুষ্যোচিত কার্য্য? কৃপণের অর্জ্জিত ধনও তাহার অবর্ত্তমানে সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারে, কিন্তু তোমার ভাগ্যলব্ধ জ্ঞানধন বিতরণে কৃপণতা প্রকাশ করিলে তোমার অবর্ত্তমানে উহা কোন্ কার্য্যে লাগিবেক? এই নিমিত্তই পুরাকালীন আর্য্য মুনিঋষিরা বিধিমত জ্ঞানদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং শাস্ত্রাদি জ্ঞান ভাণ্ডার সমূহ প্রণয়ন দ্বারা আমাদিগের যে কি মহোপকার সাধন করিয়াছেন ও কতদূর উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। বৎস! এক্ষণে তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা অসঙ্কোচে বল, কেবল কুতর্কের অনু-

বর্ত্তী হইও না। কারণ, তাহা হইলে কেহ কখন কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিবেক না।

শিষ্য। দেব! আপনার অভয়দানে আমি যার-পরনাই অনুগৃহীত হইলাম। সংসারে থাকিয়া কার্য্য করিলে যখন ঈশ্বর লাভ হয়, তখন লোকে কেন বান-প্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন?

গুরু। সেই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার পরমপদ প্রাপ্তি অতীব দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নাই। গুরু উপদেশ, ইন্দ্রিয় দমন, অভ্যাস ও সঙ্গ এই চতুষ্টয়ের পরস্পর আনুকূল্য ব্যতিরেকে পরমপদ লাভ হয় না। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি মুক্তি লাভের সাধন স্বরূপ ত্রিবিধ মার্গ। গুরু উপদেশ, এই ত্রিবিধ মার্গের পথ প্রদর্শক। ইন্দ্রিয় দমন, অভ্যাস ও সঙ্গ ইহাদিগের একমাত্র সাধন যন্ত্র। কিন্তু এতন্মধ্যে জগৎ সংসারে সঙ্গই একমাত্র বলবান্। সঙ্গের অসীম শক্তিবলে অধম উত্তম হয়, উত্তম অধম হয়। সঙ্গ দ্বারাই আমরা সদসৎ কার্য্য সমূহ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হই। বাল্য-কালে যখন পিতামাতা দাস দাসী ভিন্ন অপর কাহাকেও আপনার বলিয়া জানি না, তখন তাঁহাদের কার্য্যকলাপ আহার ব্যবহার প্রভৃতি আমাদিগের সুকুমারচিত্তে অঙ্কিত হইয়া থাকে; কিন্তু বয়োবৃদ্ধিসহকারে পিতামাতা ভিন্ন

অপর দশজনের সহিত আলাপ পরিচয় হয়, চিত্তপটে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়। অবশেষে দশজনের সহিত আহার ব্যবহার প্রভৃতি বহুতর সঙ্গলাভে আমাদিগের রুচি ও বৃত্তি সমূহ সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করে। যাঁহার যেরূপ সঙ্গলাভ হয়, তাঁহার প্রবৃত্তিও তদনুযায়ী হয়। এইরূপে আমরা সঙ্গ প্রণোদিত রুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করি। কেহ পিতা মাতার অনুসরণ করেন, কেহ বা ভাগ্যক্রমে সাধু পুরুষ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সৎপথ অবলম্বন করেন, কেহবা সংসারের অসারতা দেখিয়া নিভৃত গুহায় যোগসাধনায় রত হন, আবার কেহবা নিরঙ্কুশস্বেচ্ছার বলবতী প্রবাহে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যান। এতদ্ভিন্ন বাহ্যিক স্বভাবের সঙ্গলাভের সহিত আমাদিগের মতিগতি ভিন্ন হয়। প্রকৃতি স্বীয় বিশ্ববিমোহিনী শক্তির দ্বারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন বেশভূষায় ভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোথাও নয়নাভিরাম শ্যামল নব-দূর্ব্বাদল পরিবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে দুই একটী অতি বৃহৎ বিটপী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণশালা, গো, বৃষ, মহিষ প্রভৃতি পশুগণ চরিতেছে, আর গ্রাম্য বালকগণ প্রাণের সুমধুর উচ্ছ্বাসে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীতালাপ করিতেছে; আহা! তাহা

শ্রবণ করিলে মনে কি এক যেন অপূর্ব্ব গ্রাম্যভাবের উদয় হয়। কোথাও বা তরুলতা গুল্ম সুশোভিত নিবিড় অরণ্য—হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ নির্ভীক চিত্তে বিচরণ করিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে ভীষণ চীৎকারে অরণ্যের প্রশান্ত ভাব বিদূরিত করিয়া মনে সর্ব্বদাই শঙ্কা সমুপস্থিত করে; বোধ হয়, যেন মৃত্যু সন্নিকট। কোথাও বা স্বচ্ছ সলিলা নির্ঝরিণী গিরিকন্দর হইতে নির্গত হইয়া সুমধুর কল কল স্বনে বহিয়া যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে বিহঙ্গমগণের কূজনে নিকটস্থ প্রাণীবর্গের মন মোহিত করিতেছে, আর নিকটে কোন মহাত্মা পরমেশ পদে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়া পরম প্রীতিলাভে তন্ময় হইয়া রহিয়াছেন; তথাকার বাহিক সৌন্দর্য্যে ও সৌকুমার্য্যে মনে এক পরম পবিত্র ভাবের উদয় হয়। আবার কোথাও বা জনমানব সমাকীর্ণ কোলাহল সমাকুল রাজধানী, ঈর্ষা দ্বেষাদি কলুষিত বৃত্তি সমূহের সমাবেশে মানব জীবন দুঃখে জর্জ্জরিত; বোধ হয়, তথা হইতে শান্তিদেবী যেন চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। সঙ্গই একমাত্র উন্নতি ও অবনতির সোপান। যাঁহারা ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম, তাঁহারা নিরন্তর ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করিলে বিষম পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবেন, অধোগতি প্রাপ্ত

হইবেন, এই আশঙ্কায় সংসার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে এরূপ স্থানে গমন করেন যে, যথায় অবস্থিতি করিলে চিত্তের পবিত্রতা সম্পাদিত হয় ও একাগ্রচিত্তে পরমেশ চিন্তা করিতে পারেন। এইরূপে ইহারা কর্ম্ম যোগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ স্ব স্ব আত্মোন্নতি সাধন করিবার নিমিত্তই বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সাংসারিক মোহমায়ায় আবদ্ধ হইয়া আত্মার অবনতি সাধন করা অপেক্ষা, ইহার কিঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

শিষ্য। প্রভো! যখন সংসারের প্রায় সমুদায় লোকই ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম, তখন সংসারে থাকিয়া কার্য্য করিলে কিরূপ ইষ্টসিদ্ধির পথ সরল, তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না?

গুরু। বৎস! বিজন কাননে অবস্থিতি করিলে একমাত্র চিত্ত পরিশুদ্ধকারক স্বভাবের শোভা দৃষ্টিগোচর হয় ও সময়ে সময়ে তৎস্থানস্থিত একপথাবলম্বী ব্যক্তিগণের সঙ্গলাভ হয়, কিন্তু সংসারে পিতামাতা পরিজন ও সদসৎ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গলাভ হয়, সদসৎ কার্য্যের বিষয় কর্ণগোচর হয় ও ইহার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সদসৎ বিবেচনা শক্তি সম্যক্‌রূপে পরিমার্জ্জিত হয়। সংসারে

সমাজের ভয় আছে, কিন্তু অরণ্যে তাহা নাই। জগতে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না বলিয়াই, তুমি বনে গমন করিলে, নিভৃতে অবস্থান করিয়া অভ্যাস দ্বারা জ্ঞানের উদ্দীপনে যত্নবান্ রহিলে, কিন্তু আমি যদি সংসারে সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ করি, অথবা প্রাচীন আর্য্য মুনিঋষি মহাত্মাদিগের উপদেশানুসারে সতত কার্য্য করি, সর্ব্বদা সেই উপদেশপুঞ্জকে জপমালা করিয়া পৃথিবীমঞ্চে বিচরণ করি, তবে যখনই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করিতে উদ্যত হইব, তখনই সেই উপদেশপুঞ্জ বিবেক উদ্দীপন করিয়া আমাকে তৎসাধনে কুণ্ঠিত ও বিরত করিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অতি অল্প দিন মধ্যেই ইন্দ্রিয়গণ একরূপ আয়ত্তাধীন হয়, এবং বিবেকের শাসনে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করিতে অকৃতকার্য্য হইলে, পরক্ষণেই বৈরাগ্য সুধাপান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করি; কিন্তু তুমি ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম হইয়া বৈরাগ্য সুধাপানে বঞ্চিত হইলে। পরীক্ষা দ্বারাই আমরা উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হই, অর্থাৎ অগ্রসর হই। আমি যদি তোমা অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে অধিক পথ অগ্রসর হই, এবং যে ইন্দ্রিয় দমনকে তুমি কঠিন বলিয়া অনুসরণ করিতে বিরত হইয়াছিলে, আমি তাঁহাও সাধন করিতে পারি, তবে আমাদিগের মধ্যে কে সরল

পথ অবলম্বন করিয়াছিল? ক্রমে ক্রমে উন্নতি সাধন করাই সরল ও সাধু উপায়, কিন্তু অধিক উন্নতির আশায় বহু ক্লেশ স্বীকার করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, তদনুযায়ী ফলের আশা অতি অল্প।

শিষ্য। গুরুদেব! পাপই বা কি? পুণ্যই বা কি? সুখই বা কি? দুঃখই বা কি?

গুরু। অনন্ত প্রকৃতি ঈশ্বর প্রত্যেক জীবকে তদুপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি প্রদান করিয়াছেন। তিনি পশু পক্ষ্যাদি জীবগণকে তাহাদিগের স্ব স্ব আহার দ্রব্য সামগ্রী আহরণোপযোগী ও বাসস্থান নির্ম্মাণোপযোগী বুদ্ধি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু মানবকে এতদ্ভিন্ন হিতাহিত বিবেচনা করিবার শক্তি ও বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। ইতর জীবগণ স্ব স্ব উদর পূরণের জন্য লালায়িত, কিন্তু মানব মূল সত্যের জন্য উন্মত্ত—কিরূপে এই পৃথিবীর উৎপত্তি হইল, ইহার সৃষ্টিকর্ত্তাই বা কে, বা ইহার মূলই বা কি, ইহা জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক। মনুষ্যই কেবল সত্যের জন্য সত্যকে ভালবাসে; কিন্তু অন্য জীব সেদিক দিয়াও যায় না, ইহাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব; এই নিমিত্তই মানব অন্যান্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জল ও অগ্নির ধর্ম্ম যেরূপ শৈত্য ও উত্তাপ, মনুষ্যেরও ধর্ম্ম সেই-

রূপ মনুষ্যত্ব। জড়পদার্থ যেরূপ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবলে পৃথিবীর দিকে আকর্ষিত হয়, আমাদের আত্মারও তদ্রূপ মুল সত্যের প্রতি ঐকান্তিক স্পৃহা। বুদ্ধিবৃত্তি এই স্পৃহার অনুকূলে নিয়োজিত হইলে মানবে ধর্ম্ম বুদ্ধি উপচিত হয়। যে কার্য্য ধর্ম্ম বুদ্ধির অনুমোদিত, তাহাই পুণ্য কার্য্য; আর যাহা তাহা নহে, তাহাই পাপ কার্য্য। এতদ্ভিন্ন পাপ পুণ্য কর্ম্ম কর্ত্তার মনের ভাবের উপর নির্ভর করে। একই কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, শুদ্ধ কেবল কার্য্য লইয়াই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার্য্য হইতে পারে না। পশু পক্ষ্যাদি যদি হিংসা বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহার তাহাতে পাপ কি? মনুষ্যও যদি তাহাদিগের সমতুল্য অর্থাৎ পশু বিশেষ হইত, তবে মনুষ্য মূলেই ধর্ম্ম কার্য্যের অধিকারী হইতে পারিত না; কিন্তু মনুষ্যের, মনুষ্যত্ব আছে, মনুষ্য 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে, মনুষ্য যত্ন করিলে ধর্ম্মবুদ্ধি লাভ করিতে পারে বলিয়াই, কেবল মনুষ্যের কার্য্যেই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার্য্য হইতে পারে। পাপ পুণ্য মনের ভাবের উপর নির্ভর করে; পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠানেই আমরা চিত্ত প্রসাদ লাভ করি। এতদ্ভিন্ন শরীর রক্ষাও প্রধান ধর্ম্ম, এই নিমিত্তই দেশ-কাল পাত্রভেদে পাপ পুণ্য ভেদ। কারণ, মানসিক

সুস্থতা, শারীরিক সুস্থতার উপর নির্ভর করে, এবং ধর্ম্ম মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে। মনের অবস্থা ভাল না থাকিলে কোন কার্য্যই উত্তমরূপে বিচার করিয়া সম্পন্ন করিতে পারা যায় না। সুতরাং আমরা অনায়াসেই ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য সমূহ নিষ্পন্ন করিতে পারি। আরও যিনি শারীরিক যন্ত্রণায় অধীর, তিনি পরমেশ পদে মনোনিবেশ করিবেন কিরূপে? যিনি স্বয়ং অপটু, তিনিই আবার অপরের কাহার কি কার্য্য করিবেন?——ইহা আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

আত্মার প্রভেদ জ্ঞানেই পাপ পুণ্যের উৎপত্তি। আত্মজ্ঞান হইলে সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান হয়, পরের সুখে সুখ বোধ হয়, পরের দুঃখে দয়ার প্রবল উৎস উথলিয়া উঠে, পরের তরে আপনার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। এই সর্ব্ব-জীবোন্মুখী দয়াই পুণ্য। "পুণ্যং পরোপকারশ্চ পাপঞ্চ পর পীড়নং" পরের উপকার করাই পুণ্য, আর পরকে পীড়ন করাই পাপ; দয়া ব্যতিরেকে পরের উপকার করা কথনই সম্ভবে না।

পুণ্যবানের হৃদয়ে দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতাদি স্বর্গীয় গুণরাশি বিরাজমান করে; জগতের হিতসাধনই তাহার জীবনের ধ্রুবতারা হয়, এইরূপে তাঁহারা আজীবন পরম

সুখানুভব করিয়া মরজগতে অমর হন। আর নির্ব্বোধ পতঙ্গ যেরূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মোহনরূপে মুগ্ধ হয় ও তাহাতেই পতিত হইয়া জীবলীলা সম্বরণ করে, পাপীও তদ্রূপ কল্পিত সুখলাভের লোভে দহ্যমান ঈর্ষা-দ্বেষাদি অনন্ত দুঃখে স্বীয় জীবনকে আহুতি প্রদান করিয়া ভস্মাকারে পরিণত হয়। পুণ্য ও পাপের চরম ফল সুখ ও দুঃখ। সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্ম। আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কি ধনী, কি নির্ধন, সকলকেই ইহা ভোগ করিতে হয়। মানব আত্মা ও শরীর এই দুইটী পরস্পর বিরোধী স্বভাবাপন্ন উপাদানে নির্ম্মিত——আত্মা অসীম, কিন্তু শরীর সসীম। এই জড়শরীর আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে বলিয়া, আমরা অনুক্ষণ একটী অভাব উপলব্ধি করি; কিন্তু সেই অভাব কি? ইহা বুঝিতে প্রয়াস না করিয়া আমরা চপলতা প্রযুক্ত ইহা পূরণ করিতে সতত উদ্যত হই। এই নিমিত্তই আমরা দুঃখ ভোগ করি। যখন আমরা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি যে, আত্মা চিরন্তন অসীমাভিলাষী, তখনই আমরা আমাদিগের সেই নিত্য অভাব বুঝিতে পারি, তখন সেই অভাব পূরণে যত্নবান্ হইলে, যত্ন সফল হয়। সুখ ও দুঃখ ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক সুখ, আর আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক

ও আধিদৈবিক দুঃখ। যাহা প্রথমে বিষ সদৃশ, পশ্চাতে অমৃত তুল্য ও আত্ম বুদ্ধির প্রসাদজনিত এবং যাহাতে অভ্যাস বশতঃ দুঃখের অন্ত পাওয়া যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ কহে। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে যাহা প্রথমেই অমৃত তুল্য, কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য, তাহাকে রাজসিক সুখ বলে। নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে উত্থিত অগ্রে ও পরিণামে চিত্তের মোহকর, তাহাই তামসিক সুখ। আর রোগাদি শারীরিক ও কাম ক্রোধাদি মানসিক ক্লেশ সম্ভূত যে দুঃখ, তাহাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। দস্যু বা হিংস্র জন্তুগণ কর্ত্তৃক যে দুঃখের উৎপত্তি, তাহাকে আধিভৌতিক ও ভূমিকম্পন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দৈব কার্য্য নিবন্ধন যে দুঃখ, তাহা আধিদৈবিক দুঃখ কহে। আমরা যখন ইন্দ্রিয় বাসনা পরিতৃপ্তি করিয়া সুখলাভ করি, তখনই বোধ হয়, সমস্ত অভাবই যেন পূরণ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু হায়! কিছুক্ষণ পরেই যে অভাব, সেই অভাবই বর্ত্তমান। এইরূপে জগৎ সংসারে সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে; মানবের আশা কখন প্রস্ফুটিত ও কখন সঙ্কুচিত হইতেছে। এই মরজগৎ, যদি এই নিয়মের অন্তর্ভূত না হইত, তাহা হইলে যে কতদূর বিশৃঙ্খলা ঘটিত, তাহা বলিতে

পারা যায় না। যখন আমরা প্রকৃতির মনঃপ্রাণহারি সৌন্দর্য্য সমুদ্র দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করি; যখন আমরা নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীর বিসদৃশ রসের তারতম্য আস্বাদন করিয়া রসনা পরিতৃপ্ত করি; যখন আমরা স্বভাবের অপরিস্ফুট গীতি তরুরাজির মর্ম্মর ধ্বনি ও বিহঙ্গম-কূজন, সঙ্গীতাদির চিত্ত বিনোদন নিঃস্বন ও শিশুর অর্দ্ধস্ফুট অমৃতায়মান বচন শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর শীতল করি; যখন আমরা স্নেহের পুতলি সন্তান সন্ততির সুকুমার বদন-কমল চুম্বন করি; যখন আমরা প্রেমময়ী প্রিয়তমার অঙ্গ স্পর্শ করি, তখন আমরা সুখে আত্মহারা হই, সত্য বটে; কিন্তু হায়! তাহা ক্ষণস্থায়ী। অহো! বিধির কি বিচিত্র লিপি! এ হেন ক্ষণস্থায়ী সুখলাভের তরে মানব উন্মত্ত! কিন্তু মানব! পরমেশ প্রেমে যে কি অসীম সুখ, তাহা যদি তুমি কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিয়া একবার রসাস্বাদন কর, তবে তুমি ইন্দ্রিয় জনিত সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে, সন্দেহ কি! সত্য, আমাদিগের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই সুখের উন্মুক্ত দ্বার স্বরূপ, মনোবৃত্তি সমুহ অশেষবিধ সুখের অধিরোহিণী মাত্র; কিন্তু যে সুখ ক্ষণস্থায়ী, সে আবার সুখ কি? যাহা পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি হইল না, বরং উত্তরোত্তর পিপাসা বর্দ্ধিত হইল, কেবল পান কালীন

উহার কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছিল মাত্র, তাহা সুধা না বিষ? এই ক্ষণস্থায়ী সুখের সৃষ্টি কেবল দুঃখের কঠোর দংশনের স্বাদ পরিগ্রহের নিমিত্ত। অবিচ্ছিন্ন স্থায়ী আনন্দের ভাবই যথার্থ সুখ, আর বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিলে কেবল আনন্দ অনুভব হয় মাত্র। সাত্বিক সুখই যথার্থ সুখ নামে অভিহিত হইতে পারে। জ্ঞান ব্যতিরেকে সাত্বিক সুখলাভ অসম্ভব। মানবে জ্ঞান উদ্রিক্ত হইলে তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, আত্মা অসীমের দিকে ধাবমান হইতে গিয়া প্রায়ই প্রতিপদে প্রতিবন্ধক সমাকুল হয়, দুঃখ অনুভব করে। তখন দুঃখ স্বাভাবিক বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, তখন জ্ঞান হয়, মানব পরস্পর বিরোধী স্বভাবাপন্ন উপাদানে গঠিত, আত্মা অসীমের দিকে ধাবমান; কিন্তু শরীর সর্ব্বদাই তাহাকে সীমাবদ্ধ করিতে যত্নবান্। দুঃখ যখন আমাদিগের জীবন হইতে অপসারিত করা একরূপ অসম্ভব, তখন কেন আমরা উহাকে অপ-সারিত করিতে বৃথা প্রয়াস করি? তখন কেন আমরা সুখাভিলাষী হইয়া অধিক দুঃখ ভোগ করি? ইহার প্রয়োজন কি? আমরা কেন প্রসন্ন মনে সুখ দুঃখ উভয়কেই আলিঙ্গন করি না? সুখ দুঃখে বিমুগ্ধ বা কাতর হইয়া মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে বিরত

হই কেন? কর্ত্তব্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হই কেন? অলীক সুখের তরে অমূল্য সন্তোষ রত্ন হারাই কেন? সন্তোষই সুখের যথার্থ আকর। সন্তোষলাভ করিলেই একমাত্র অবিচ্ছিন্ন সুখলাভ করা সম্ভবপর। কারণ সন্তোষের পবিত্র সংস্পর্শে মন সুখ দুঃখে বিচলিত হয় না, মন এক অসীম বল লাভ করে; সেই বলে বলীয়ান্ হইয়া সর্ব্বদাই আমরা কর্ত্তব্য প্রতিপালনে তৎপর হই—অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করি।

"সন্তুষ্টস্য সদা সুখম্।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিষ্য। প্রভো! পরমপিতা পরমেশ্বর সাকার না নিরাকার? দেবদেবীর উপাসনা ও শ্রাদ্ধাদির উদ্দেশ্য কি? দেব! আশা করি, ইহার গূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাপনে কুণ্ঠিত হইবেন না।

গুরু। বৎস! কুণ্ঠিত হইবার কথাই বটে; কারণ, পৃথিবীতে সকলে একপথাবলম্বী নহেন। আরও লোকে আজ যাহাকে সামান্য কাঁচ জ্ঞানে করিয়া হাসিয়া দূরে

নিক্ষেপ করিলেন, দু'দিন পরে তাহাই মহামূল্য মণি জানিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকেন; হাসি-কান্না একরূপ জগতের স্বধর্ম্ম স্বরূপ। সিদ্ধপুরুষ কপিল, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য, অমিত বুদ্ধিশালী গৌতম কণাদ প্রভৃতি জগতের উজ্জ্বল তারকারাজি, স্ব স্ব জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া সুনীল গগনে দীপ্তি পাইতেছেন, জগতের অন্ধকার দূর করিতেছেন, ইঁহাদের কথায়ও যখন লোকে হাসিয়াছে ও কাঁদিয়াছে, তখন মাদৃশ ক্ষুদ্র বুদ্ধিশালী মানব অসঙ্কোচে এই সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি!

কিন্তু বৎস! যাহাই হউক, তোমার প্রীতিসাধনার্থে এই সকল গুরুতর বিষয়ের উদ্দেশ্য সাধ্যমত বলিতেছি শ্রবণ কর, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইব, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, তাহা পরম পিতা পরমেশ্বরের কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সেই বিশ্ববিভু বিশ্ব পিতার উপাসনা প্রথা প্রচলিত আছে। দশদিন অগ্রে ও পশ্চাতে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল না, ও থাকিবেক না; সময়ের অপূর্ব্ব গতির সহিত ইহারও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। কিন্তু উপাসনা প্রথার পার্থক্য

বিদ্যমান থাকিলেও সকলেই সেই দীনদয়াল এক মূলসত্য পরমেশ্বরকে ভজনা করিতেছেন, তাঁহাকে কেহ নিরাকার ভাবিয়া উপাসনা করেন, আবার কেহবা তাঁহাকেই সাকার ভাবিয়া উপাসনা করেন; সুতরাং রুচি ও অধিকারের প্রভেদ ভিন্ন কোন বিরোধ নাই। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর সাকার না নিরাকার? বায়ুর যেরূপ আকার নির্ণয় করা অসম্ভব, কেবল সঞ্চালনের মান্দ্য ও প্রাবল্য বশতঃ ইহার কার্য্যকারিতা ও প্রভূত শক্তি অনুমিত হইয়া থাকে। সেইরূপ পরমপিতার আকার নির্ণয় করাও অসম্ভব, তবে যে কোন আধারেই তাঁহার ঐশিক শক্তি সমধিক পরিমাণে উদ্ভাবিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকেই তখন আমরা যেন ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করি। অহো! বিধির কি বিচিত্র কৌশল! সংসারে কোন বস্তুই সম্পূর্ণ নহে। পশু পক্ষ্যাদি জীবগণের চক্ষুকর্ণাদি সত্ত্বেও বাক্‌শক্তি ও বিবেকশক্তি রহিত, আবার মানবের এ সমুদায় সত্ত্বেও সেই দীনদয়াল পরমেশ্বরের বিরাট মূর্ত্তি দর্শন করে, এরূপ ক্ষমতা নাই। কিন্তু যখন দেখিতেছি, শুকশারী পক্ষিগণ শিক্ষিত হইলে পরিষ্কার মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারে, অশ্ব কুক্কুরাদি জীবগণও প্রভুভক্ত ও প্রভুর আকার ইঙ্গিত স্পষ্ট বুঝিতে পারে; সিংহ

ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণও তাড়নের ভয়ে কিয়ৎ পরিমাণে শিষ্টশান্ত হয়, তখন মানব উদ্যমশীল হইয়া উপাসনাদি কার্য্য করিলে যে পরমপদ লাভ করিতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে, **'যত্নেন কিমপি ন সিধ্যতি'**।

ধন্য কৃপানিধান! তোমার লীলা অনন্ত! কখন তুমি গুণাতীত নিরাকার, আবার কখন তুমি সগুণ সাকার। পরমপিতা যখন সৃষ্টি করিতে বাসনা করেন, তখন তিনি সগুণ সাকার হইয়া রজোগুণে ব্রহ্মারূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে বিশ্বসংসার পালন করেন, আর তমোগুণে মহেশ্বররূপে বিশ্বসংসার সংহার করেন। তিনি একই, কেবল ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াশীল হন মাত্র। আর ভগবান্ ভক্তের অধীন, ভক্ত যে ভাবে তাঁহাকে ভাবিয়া থাকেন, তিনি ভক্তকে সেই ভাবেই কৃপা করেন। তবে কেন আমরা ইহা লইয়া বৃথা আন্দোলন করিয়া জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করি? হায়! আমরা যদি চিরজীবনই তাঁহার রূপ আন্দোলন করিয়া মনকে আলোড়িত করিলাম, সন্দেহের বিষম জালে জড়িত হইয়া মরীচিকার পশ্চাৎ ধাবমান হইলাম, তবে তৃষ্ণাও মিটিল না, দুর্লভ মানব জন্ম জন্মের মত হারাইলাম। আজীবন কেবলমাত্র তাঁহার চিত্র অঙ্কিত করিতে

লাগিলাম, কিন্তু তাঁহার উপাসনা করিবার দিন পাইলাম না, ইহা অপেক্ষা দুরদৃষ্ট আর কি হইতে পারে!

তালবৃন্ত ব্যজন করিলে যেরূপ বায়ুর অনুভবে শ্রান্তি দূর হয়, শরীর শীতল হয়, সেইরূপ উপাসনাদি কার্য্য দ্বারা ভগবৎ প্রেমানন্দ লাভ করিতে পারিলে সাংসারিক মোহমায়া জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয় ও শান্তিলাভ হয়। জগতে দুই প্রকার উপাসনা প্রথা প্রচলিত আছে, কেহ তাঁহাকে সগুণ সাকার ভাবে উপাসনা করেন, আর কেহ তাঁহাকে নির্গুণ নিরাকার ভাবে উপাসনা করেন, কাহার চরম-লক্ষ্য ভক্তি, কাহার চরমলক্ষ্য নির্ব্বাণ মুক্তি। যথার্থ উপাসনাই ভক্তি প্রসূত। সাধনা ব্যতীত ভক্তি কিছুতেই জন্মিতে পারে না। শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়, ও ধ্যান ধারণা ও তপস্যা যথাক্রমে সাকার ও নিরাকার উপাসকগণের সাধনা। ভক্তি আবার দুই প্রকার, গৌণ ও মুখ্য। মুখ্য ভক্তির অনেক বিঘ্ন আছে; যাহা দ্বারা এই সমুদায় বিঘ্ন নষ্ট হয়, তাহারই নাম গৌণ ভক্তি, আর ঈশ্বর চিন্তাই মুখ্য ভক্তির উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন, ফল পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা বন্দনা এবং প্রতিমার পূজাদি গৌণ ভক্তির লক্ষণ। মানব যতদিন আপনার হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে

জানিতে না পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত প্রতিমাদি পূজা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করা ও ভক্তির পথ সরল করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমে 'কর, খল,' শিখিয়া 'ঐক্য, মাণিক্য' শিক্ষা করাই চিরন্তন প্রথা ও যুক্তি-সঙ্গত। প্রথমে ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনাই বল, আর যাহাই বল, দেবদেবীর উপাসনা দ্বারা ভক্তিলাভ করা প্রয়োজনীয়। কল্পিত বস্তুর প্রতি কি ভক্তি সম্ভবে? যাঁহাকে চক্ষে দেখিলাম না, তাঁহার প্রেমে কিরূপে মুগ্ধ হওয়া যাইতে পারে? আমরা শঙ্করাচার্য্য, সক্রেটিস, নিউটন প্রভৃতিকে স্বচক্ষে দেখি নাই, সত্য বটে; কিন্তু তাঁহাদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁহারা শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়া পড়েন, এ কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু যিনি জ্ঞানের দাস, তাঁহারই চক্ষে সক্রেটিস মহাপুরুষ, যিনি বিজ্ঞানবিৎ তিনিই নিউটনের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। যে যাহার মর্ম্ম গ্রহণে অপটু, তাহার তাহাতে শ্রদ্ধা বা ভক্তি জন্মিবে কেন? এইরূপ ব্যক্তিগত ভাব ভিন্ন। যাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, ঈশ্বরের নামেই তাঁহার হৃদয় ভক্তি রসে আর্দ্র হইবে আশ্চর্য্য কি? কালিদাস বহুদিন ইহ-সংসার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আশ্চর্য্য কবিত্ব শক্তির নিমিত্ত এখনও কি তাঁহার নাম মানব মনে

ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না? এখনও কি তাঁহার গ্রন্থাবলী পণ্ডিতগণের আদরের ধন নহে? এখন কি তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে কেহ পূজা করেন না? আস্তিকই ঈশ্বরের নামে ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া যায়, ভাবগ্রাহী পণ্ডিতই কালিদাসের কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়, কিন্তু নাস্তিক বা মূর্খের নিকট কিরূপে এরূপ সুফল আশা করা যাইতে পারে? এতদ্ভিন্ন অভ্যাস দ্বারা ভালবাসা ভক্তি উভয়ই জন্মিতে পারে। দেখ, যখন আমাদের সন্তান সন্ততি প্রসূত হইয়াই নষ্ট হয়, তখন কেবল ভালবাসার ধন হারাইলাম বলিয়াই কষ্ট হয়, কিন্তু সেই শিশু যদি ছয় সাত বৎসরের হয়, যখন সে মধুর সম্ভাষণে হৃদয় শীতল করিতে থাকে, যখন সে পরম অপত্য স্নেহের স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়ায়, তখন সেই ধন হারাইলে আমাদের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করে; তাহাই বা কেন, অপরের সন্তান যদি আমাদের নিকট কয়েক দিবস অবস্থিতি করে, তাহারই প্রতি যেন কেমন এক বাৎসল্যভাব জন্মায়, তখন যে দেবদেবীতে ভক্তি ভালবাসা অবশ্যই জন্মাইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দেবদেবীর উপাসনা দ্বারা ভক্তিভাব উদ্রিক্ত করা যায়, পরে সেই ভক্তি ঈশ্বরপদে নিয়োজিত হইলে পরমার্থ

লাভ হয়। ক্ষুদ্র মহৎ সকল বিষয়েরই উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ্যবিহীন জগতে কিছুই নাই। দেবদেবীর উপাসনা আত্মোন্নতির সাধু ও সরল উপায়। কারণ, অনন্ত প্রকৃতি ঈশ্বর আমাদের উন্নতির প্রথম আদর্শ হইতে পারেন না। অধিক কথায় প্রয়োজন কি, এই বিশাল পৃথিবী বক্ষেই দেখনা, কোথাও দেবদেবীর, কোথাও গুণাধিক্য ব্যক্তি-বিশেষের, কোথাও প্রকৃতির উপাসনা প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে দেবদেবীর উপাসনা বর্ত্তমান আছে বলিয়া যাঁহারা হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করেন, কৌতুক উপহাস করেন, কিন্তু তাঁহারাও কি সে ভাবে পৌত্তলিক নহেন? হিন্দুরা যেভাবে দেব-দেবীর উপাসনা করেন, তাহারাও কি ঠিক সেই ভাবে বিশু শাক্যসিংহ মহম্মদের উপাসনা করেন না? এরূপ আমাদের পরস্পরের বিদ্বেষভাব অন্তর্হিত হইলে পৃথিবী যে সুখাগার হইত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কি আশ্চর্য্য! সকলেই পরের ভ্রম দেখাইতে পটু, সকলেই আপনার জ্ঞানে আপনাকে উচ্চ দেখেন। যাহাই হউক, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র—কল্পনা, যুক্তি ও দার্শনিক তত্ত্ব এই তিনটী প্রধান উপাদানে গঠিত। আমরা দেবদেবীর উপাসনা-কালীন আমাদের জীবকলা বিগ্রহাদিতে ধ্যান করিয়া

আবাহন করি ও বিসর্জ্জন কালীন সেই হৃদয়স্থ অধো-মুখী জ্যোতিঃ জীবাত্মায় প্রবিষ্ট জ্ঞান করি, ইহাতে কি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় না যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্মিলনই মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও পরম সুখ? দেবদেবীর উপাসনা দ্বারা যে উপকার ভিন্ন অপকার সাধিত হয় না, ইহা এতদ্ভিন্ন বহু প্রকারে প্রমাণিত হইতে পারে; কিন্তু এক্ষণে বিবৃত বিবরণে ক্ষান্ত হইয়া অতি সংক্ষেপে বলিলাম, এবং শ্রাদ্ধাদির বিষয়ও তদনুরূপ সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্দেশ্য অতি সাধু। যখন পিতামাতা বা অন্য কোন প্রিয়জন আমাদিগের নিকট হইতে কাল কর্ত্তৃক অপহৃত হন, তখন আমরা শোক সাগরে ভাসমান থাকি, এবং ঐ শোকাগ্নি সময়ে সময়ে এরূপ প্রবল তরঙ্গাকুল হয় যে, আমাদিগের জলমগ্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সেই ভীষণ মহার্ণবে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া অবলম্বন মাত্র।

কোন প্রিয়জনের পরলোকান্তরে আমাদিগের আত্মীয় বন্ধুস্বজন আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া থাকেন ও কিয়দ্দিন অবস্থিতি করণান্তর আমাদিগের শোকাপনোদনে স্বতঃ পরতঃ যত্নবান্ থাকেন। ভগ্ন কাষ্ঠাবলম্বন করিলে যেরূপ মগ্নপ্রায় মানব জীবন রক্ষা

হয়, সেইরূপ আত্মীয় স্বজনের সহানুভূতি প্রকাশক উক্তি সমূহ শ্রবণান্তর শোকসন্তপ্ত মানব জীবন কিঞ্চিৎ শীতল হয়। অশৌচ হইতে শুদ্ধ হইবার ক্রিয়াকে শ্রাদ্ধ বলে। ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে যথাসাধ্য দান ধ্যান ও আত্মীয় স্বজনের অভ্যর্থনাদি করা, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অপরিহার্য্য কার্য্য। ইহার মর্ম্ম এই যে, ইহাতে ব্যাপৃত থাকিলে, আমাদিগের শোকাগ্নি কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত হইবে। যাঁহাদের সহিত আজন্ম বাস করিয়া আসিয়াছি, অদ্য তাঁহাকে ভাগ্যদোষে জন্মের মত হারাইলাম, আর তাঁহার সেই অমৃতময় স্নেহবাণী কর্ণগোচর হইবে না, যখন এইরূপ মনে ধারণা হয়, তখন কি আর মানব শরীরে জীবন থাকে; যদিও থাকে, তাহার আচার ব্যবহার উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়ে। আমাদিগের ভারত-বর্ষীয় আর্য্য রমণীরা যাঁহারা পতির বিরহে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে শরীর বিসর্জ্জন করিয়া হৃদয়াঙ্গারের মলিনত্ব দূর করিতেন, স্বামীর সহগামিনী হইতেন; শুদ্ধ কেবল ভারতবর্ষে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে এইরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, কোথাও জলন্ত অনলে, কোথাও বিষ পানে, আর কোথাও না হয় অতল জলধি গর্ভে শরীর বিসর্জ্জন করিয়া চিরদিনের জন্য হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতেন।

বলা বাহুল্য যে, পরিণাম সকলেরই এক; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পাশ্চাত্য-সভ্যতা হিন্দুর সহ-মরণের প্রতি যেরূপ তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন, বিষ পান, সলিলে জীবন সমর্পণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সেরূপ কঠোর বাণী বর্ষণ করেন না। যাহা হউক, এই ভয়ানক শোকাগ্নি শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে নির্ব্বাপিত হয়। আমাদিগের শাস্ত্র বলেন যে, শ্রাদ্ধাদির দ্বারা পরলোকগত পিতামাতার প্রেতাত্মার মুক্তিলাভ হয়। যদি পুত্র হইয়া তাঁহাদিগকে নরক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে না পারিলাম, তবে তাঁহারা যে আজন্ম আমাদিগের সুখের নিমিত্ত আপনার সুখ জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাহার কি এই প্রতিদান? এইরূপ চিন্তা করিয়া আমরা সেই সময়ে জীবন বিসর্জ্জন করিতে অর্দ্ধক্ষণ কুণ্ঠিত হই, এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনান্তর তজ্জনিত বিমল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। কালে আমাদিগের শোকদগ্ধ হৃদয় শান্তি লাভ করে। কিন্তু এরূপ চিন্তার উদ্রেক না হইলে যে, দুঃসহ শোকাগ্নি মানবকে দগ্ধ করিয়া মৃত্তিকাকারে পরিণত করিত বলা বাহুল্য। এতদ্ভিন্ন শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকাণ্ড আমাদিগের পিতা পিতামহের একরূপ পবিত্র স্মৃতি চিহ্নমাত্র; ইহা তাঁহাদিগকে যে কেবল স্মৃতিপথে আরূঢ় করায়, তাহা নহে, ক্রিয়াকাণ্ড

দ্বারা মনকে এরূপ বিশ্বাস করায় যে, তিনি পরলোকে গমন করিয়া জ্যোতির্ম্ময় হইয়া আমাদিগের ক্রিয়াকলাপ অবলোকন করিতেছেন ও যেন জীবিত রহিয়াছেন। ইহলোকে কোন কোন বস্তু তাঁহাদিগের গোপনীয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃ ধারণ নিবন্ধন সমস্তই তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, কিঞ্চিন্মাত্রও অগোচর থাকিবেক না। তাঁহাদিগের উদ্দেশে শ্রদ্ধার উপহার স্বরূপ ভোজ্য বস্তু সমুদায় প্রদান করিয়া থাকি, ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা গ্রহণ করাইয়া ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিয়া থাকি। ইহার মর্ম্ম এই যে, তাঁহাদিগের জীবিতাবস্থায় তাঁহাদিগের সমক্ষে যেরূপ কোন নীতিগর্হিত বা সমাজ বহির্ভূত কার্য্য করিতে অক্ষম ছিলাম, এক্ষণে তাঁহাদিগের অবর্ত্তমান জ্ঞান করিয়া নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছার প্রবল বলে বলীয়ান্ হইয়া সেই সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতে তিলার্দ্ধ সঙ্কোচ করিব না বলিয়াই পুরাকালের আর্য্যঋষিরা এই প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। সেই স্বর্গীয় পিতা পিতামহাদির সময়ে সময়ে নাম স্মরণ মাত্রেই তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপ মনে উদ্রিক্ত হইয়া বংশের গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষার আশঙ্কায় অসৎ পথ হইতে আমাদিগকে বিরত করে। বৎস! তুমি ইহা অনায়াসে বলিতে পার যে, যখন পিতামাতা প্রভৃতি

গুরুজনকে স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি না, তখন আর কুকর্ম্ম সমূহ সম্পন্ন করিতে ভয় কি? কিন্তু তদুত্তরে আমার এই বক্তব্য যে, পাপপথগামী মন সর্ব্বদাই সশঙ্কিত; শুষ্কপত্র বৃন্তচ্যুত হইয়া পতিত হইলে তাহাকে মানবের পদধ্বনি জ্ঞানে সর্ব্বদাই চমকিত হয়, সরল কথায় জটিল অর্থ করিয়া আপনার গুপ্ত কথা বা মনোভাব অনিচ্ছা-সত্ত্বেও স্বয়ং ব্যক্ত করিয়া ফেলে। তস্কর যখন জানিতে পারে যে, তাহার অনুসন্ধানে লোক সতত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, তখন আর চৌর্য্যবৃত্তি অনুসরণ করা দূরে থাকুক, সর্ব্বদাই সশঙ্কিত হয়; কিন্তু যে সকল তস্কর রাজার পীড়নকে পীড়ন জ্ঞান করে না, তাহারা কিছুতেই তাহা-দের চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না। ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন;——

"ক ঈপ্সিতার্থ স্থির নিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।"

মনের যে দিকে গতি বা মন যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহার প্রতিবন্ধক প্রদান কর, মন অমনি নিম্নগামী জলের ন্যায় সেই পথই অনুসরণ করিবেক। সেইরূপ যাহারা ভয় লজ্জাদি সামাজিক শৃঙ্খল অবহেলন

করিয়াছেন, তাঁহাদের আর উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বে পাপানুষ্ঠান করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের মন, হয় উচ্চাভিলাষ অথবা অলীক সুখলাভ করিবার নিমিত্ত কখন কখন পাপোন্মুখ হয়, তখন যদি মনে এরূপ বিশ্বাস হয় যে, গুরুজনেরা অলক্ষিত ভাবে অবস্থান করতঃ তাঁহাদের কার্য্যকলাপ অনুধাবন করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহারা কলুষিত কার্য্য সম্পাদনে কখনই সক্ষম হন না, বরং সর্ব্বদাই লজ্জিত, সঙ্কুচিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ সর্ব্বজন প্রশংসিত জগতের শ্রেষ্ঠ কবি সেক্সপিয়রের ম্যাকবেথে পরিদৃষ্ট হয়। ম্যাকবেথ যদি কলুষ মতি পাপিষ্ঠা ভার্য্যার অনুশাসনে অনুপ্রাণিত না হইতেন, তাহা হইলে কখনই তিনি স্বয়ং বৃদ্ধ ডন্‌ক্যানের প্রাণনাশ করিয়া রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না, বিষম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিতেন না, জনসাধারণের নিকট ভয়ঙ্কর ঘৃণার পাত্র হইতেন না। মরি! মরি! ইহার কি সাধু উদ্দেশ্য! ইহা আমাদিগের পিতা পিতামহ ও মাতা মাতামহ প্রভৃতি স্বর্গীয় মহাত্মাগণের নাম যশ ও কীর্ত্তিকলাপ স্মৃতিপথে সমারূঢ় করিয়া প্রতি শিরায় শিরায় রক্তের গতি প্রবলতর করে, এবং তাহাদিগকে অনুকরণ

করিতে স্বতঃই ইচ্ছা বলবতী হয়, এবং যদি তাঁহারা অপরিণামদর্শিতা প্রযুক্ত কোন নীতিগর্হিত অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া লোকের নিকট নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন, তবে সেই সমুদায় কর্ম্ম করিতে আমরা সর্ব্বদাই ভীত ও নিবৃত্ত হই। অবশেষে ইহা অতি প্রচ্ছন্নভাবে প্রমাণ করে যে, আত্মার বিনাশ নাই, আত্মাই কর্ম্মফল ভোগ করেন, আমাদের দেহান্তর হয় মাত্র। বাল্যকালে গুরুজন কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করিলে, আমরা কেমন বাল্যসুলভ স্বভাব বশতঃ তাহাই করিতে উদ্যত হই, তখন আর তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া আমাদিগকে প্রহার করেন। ইহার মর্ম্ম এই যে, তৎকালে আমাদিগের হিতাহিত বিবেচনাশক্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় নাই, তখন ন্যায় ও অন্যায় বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা। তাঁহাদের প্রহারের ভয়েই আমরা অগ্নিতে হস্ত প্রসারণ করিতে ভয় পাইতাম, সর্পের সহিত ক্রীড়া করিতে বিরত হইতাম। কিন্তু যখন পরিণত বয়সে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের সেই বাল্য-কালীন নিষ্ঠুর প্রহারের সাধুমর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হই, তখন তাঁহাদের নিকট যে কতদূর কৃতজ্ঞতা বোধ করি, তাহা বলিতে পারা যায় না। সেইরূপ আর্য্যঋষি, মুনি মহাত্মাগণ কৃত ক্রিয়াকলাপকে পণ্ডশ্রম বলিয়া অনুমিত

হয়, এবং অধিকন্তু সমাজের. শিথিলতা নিবন্ধন এতৎ-সাধনে অনেকেই বিরত হন; কিন্তু যদি আমরা পিতৃ-স্থানীয় আর্য্যমহাত্মাগণ কৃত এই সকল ক্রিয়াকে শুভকর, এইমাত্র বিশ্বাস করিয়া এতৎ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করি, তবে পরে ইহার উপকারিতা সর্ব্বতোভাবে বোধগম্য করিতে সক্ষম হই। প্রথমেই অধীর হইলে কোন ফলোদয় হয় না। তোমার মনে এরূপ প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, তাঁহারা কি জীবিত আছেন? যদিও তাঁহাদিগকে স্বপ্নাদিতে দেখিতে পাই ও তদবস্থায় তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথনাদি হয়, তবে কেন জাগ্রদাবস্থায় আমরা তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ করি না? জাগ্রত অবস্থায় দৃশ্যমান পদার্থ সকল স্থায়ী, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় তাহা অস্থায়ী। এই উভয় অবস্থায়েই জ্ঞান একমাত্র, কুত্রাপি ইহার প্রভেদ হয় না। সুষুপ্তি হইতে উত্থিত জাগ্রত ব্যক্তির এইরূপ বোধ হয় যে, সুষুপ্তিকালে কিছুই অবগত ছিলাম না, অজ্ঞানের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিলাম, এইরূপ বোধকেই স্মরণ বলা যায়। কারণ, জাগ্রত অবস্থায় তৎ তৎবিষয়ে চক্ষুঃ সংযোগাদি নাই। আর পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে কখন কোন পদার্থের কোন স্মরণ হইতে পারে না, অতএব সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানের বোধকে অবশ্য প্রত্যক্ষ

বলিয়া স্বীকার করা যায়। জ্ঞান ব্যতীত বস্তু প্রত্যক্ষ হয় না; সুতরাং সুষুপ্তিকালে জ্ঞানের সত্ত্বা স্বীকার করিতে হইবেক। জ্ঞান নিত্য বস্তু। এই জ্ঞানই আত্মা। অতএব আত্মাও নিত্য বস্তু। এতদ্ভিন্ন নিদ্রিতাবস্থায় যদি কেহ কোন পরিচিত ব্যক্তির নাম আমাদিগের কর্ণকুহরে উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা স্বপ্নে দেখিতে পাই, এবং আমরা যে বস্তু কখনও নয়নগোচর করি নাই, তাহা কি কখন স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট হয়? এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কি সুষুপ্তি, কি স্বপ্ন, কি জাগ্রত, সকল অবস্থা পরস্পর প্রভেদ সত্ত্বেও আত্মার উদয় বা অস্ত নাই, স্বপ্রকাশ স্বরূপ। আমাদের দেহান্তর হয় মাত্র, কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই, আত্মাই কর্ম্মফল ভোগ করেন, এই স্থূল দেহ কেবল অবলম্বন মাত্র। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের দেহান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের আত্মার নাশ হয় নাই।

শিষ্য। প্রভো! স্বর্গ ও নরক কি? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এরূপ কি কোন স্থান বর্ত্তমান আছে, যাহার নাম স্বর্গ বা নরক।

গুরু। বৎস! আমাদিগের শাস্ত্রে বহুপ্রকার স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহা কতদূর সত্য

বলিতে পারা যায় না; কিন্তু ইহা অবধারিত যে, তাঁহাদের ইহাতে কোন না কোন সাধু উদ্দেশ্য বর্ত্তমান আছে, হয়'ত নরকের ভীষণ ভীষণ চিত্র মানবগণের মানসপটে উদিত হইয়া তাহাদিগকে অসৎপথ অবলম্বন করিতে বিরত করিবে, এবং স্বর্গের অক্ষয় সুখের কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদাই সেই অতুলানন্দ লাভ করিবার জন্য তাহারা সদনুষ্ঠানে রত থাকিবে। কিন্তু যাহাই হউক, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, বহির্জগতের সহিত স্বর্গ বা নরকের কোন সম্বন্ধই বর্ত্তমান নাই—এমন কোন স্থান বর্ত্তমান নাই, যাহার নাম স্বর্গ বা নরক।

এই লীলাভূমি মর্ত্তেই আমরা কর্ম্মফল ভোগ করি, এবং পাপ পুণ্য অনুসারে স্বর্গে বা নরকে অবস্থিতি করি। এক পিতামাতা-সম্ভূত পুত্রগণ একরূপে শিক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়াও ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মতিগতি সম্পন্ন হয়, যখন তাহাদের মধ্যে একজন রাজরাজেশ্বর হইয়া শত সহস্র লোককে প্রতিপালন করিতে সমর্থ ও সকলের প্রীতিভাজন, অন্যে স্বীয় উদর পূরণের জন্য লালায়িত ও সকলের ঘৃণাস্পদ, তখন যে আমরা কর্ম্মফল ভোগ করি, তাহা আর অণুমাত্র সংশয়াবৃত হইতে পারে না। কারণ জগৎপিতা জগদীশ্বরের চক্ষে সকলেই সমান।

আরও দেখ, মহারাজ যুধিষ্ঠির যিনি স্বয়ং ধর্ম্মের অবতার, যিনি অমিত-বল-বীর্য্যশালী ভীমার্জ্জুনকে ভ্রাতৃরূপে ও স্বয়ং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধুরূপে পাইয়াও সাধারণ মানবের ন্যায় সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, তখন ইহা অপেক্ষা কর্ম্মফলের সুস্পষ্ট উদাহরণ আর কি দৃষ্ট হইতে পারে? ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বয়ং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সহায় হইলেও জীব সংসারে ব্যাপৃত থাকিলে কর্ম্মফল ভোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। আমরা মনেই স্বর্গ বা নরক ভোগ করি——ইহার স্থান ও সম্বন্ধ অন্তর্জগতে। ঐ দেখ দুর্য্যোধন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও সর্ব্বদাই ঈর্ষা দ্বেষাদি কলুষিত বৃত্তিনিচয়ের বশবর্ত্তী হইয়া জীবনে একদিনের তরেও সুখী হন নাই, সর্ব্বদাই পরের অনিষ্ট সংঘটনে বিবৃত থাকিয়া অকালে আপনার জীবন আপনি হারাইলেন; আর ঐ দেখ দরিদ্র বিদুর তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত হইয়া পরমেশ-প্রেমে মুগ্ধ, দরিদ্র হইয়াও অতুল সম্পদের অধিকারী, তাহার চিত্ত সর্ব্বদাই আনন্দ সাগরে ভাসমান। হায়! সংসারে অনেকেই মনে করেন যে, অর্থ, উন্নত পদ বা অবস্থাই স্বর্গ নরক উপভোগের হেতু, কিন্তু তাহা কথনই নহে। রাজা বহু মূল্য পরিচ্ছদাদি ও নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য রত্নাদি দ্বারা

বিভূষিত হইয়া বিচিত্র চন্দ্রাতপ সুশোভিত স্বর্ণ সৌধে উপবেশন করিয়া রাজ্যশাসনে ও প্রজা পালনে কোথায় সুখানুভব করিবেন, না তাঁহার হৃদয় চিন্তামুর্ম্মুর দহনে সুখের লেশমাত্র অনুভব করিতে অক্ষম; কিন্তু তরুতল সমাসীন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত যোগী, পরমেশ চিন্তায় অনুক্ষণ পরম আনন্দ লাভ করেন। সকলের মনের গতি যদি একরূপ হইত এবং সকলের সংস্কারও যদি তদনুরূপ এক হইত, তাহা হইলে স্বর্গ বা নরক ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন-রূপে প্রতীয়মান হইয়া তাহাদিগকে ভ্রমগ্রস্থ করিত না। কেহ সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্যকে, কেহ বাঙ্গালার নবাব সিরাজদ্দৌল্লার ন্যায় নৃশংস আচরণকে, কেহ নেপো-লিয়নের ন্যায় সহস্র সহস্র অবোধ মানবকে সমরানলে আহুতি প্রদান করাকে, কেহ আমোদ-প্রমোদ আহার-বিহারকে ও কেহ সত্য দয়াদি কোমল বৃত্তি সমূহের অনু-শীলনে যত্নপর থাকিয়া পরমেশ পদে মতি অর্পণ করাকে স্বর্গ সুখ জ্ঞান করেন; কিন্তু যখন আমরা পরের দুঃখ মোচন করিয়া থাকি, যখন আমরা শুশ্রূষাদি দ্বারা পীড়িত ব্যক্তির সুস্থতা সম্পাদন করিয়া থাকি, যখন আমরা নিরা-শ্রয় ব্যক্তির আশ্রয় স্বরূপ হইয়া থাকি, যখন আমরা ক্ষুধার্ত্ত নিরুপায় ব্যক্তিকে অন্নদানাদি দ্বারা তাহার অভাব

মোচন করিয়া থাকি, তখন আমরা স্বর্গে না নরকে? তখন আমাদের মন আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে, না রোগশোকাদির আক্রমণে জর্জ্জরিত হয়? তখন আমরা বিমল আনন্দে বিভোর হইয়া থাকি, না স্ব স্ব স্বার্থোন্নতির চিন্তা করিয়া অনুক্ষণ অভাব অনুভব করিয়া থাকি?

বৎস! যখন আমাদের মন সত্ত্ব প্রধান হয়, যখন উহার কোন অভাব থাকে না, যখন উহা সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ, এইরূপ আবর্ত্তিত চক্রের বশবর্ত্তী না হইয়া নিরন্তর প্রীতিলাভ করে, যখন দয়া দাক্ষিণ্যাদি কোমল বৃত্তিনিচয়ের পূর্ণ বিকাশ হয়, তখনই আমরা স্বর্গ ভোগ করি; আর যখন আমরা রিপুবর্গের বশবর্ত্তী হই, যখন আমরা ঈর্ষা দ্বেষাদি কলুষিত বৃত্তিনিচয়ের স্ফূর্ত্তিতে পরের অপকার সাধনে তিলার্দ্ধ সঙ্কোচ করি না, পরের উন্নতিতে হৃদয়ে দগ্ধশলাকা ভেদ করে, তখনই আমরা নরক ভোগ করি। লোকে এ সকল বিষয়ের নিগূঢ় অর্থ ভেদ করিতে না পারিয়া সরল বিষয়ও বিষম জটিল করিয়া ফেলেন। বৎস! অধুনাতন সকলেই আপনাকে জ্ঞানবান্ মনে করেন; আর তাঁহারা ভাবেন যে, তাঁহাদের সকলের জ্ঞান ও বুদ্ধি একরূপ, অথবা প্রত্যেকেই আপনাকে অপর অপেক্ষা বিশিষ্ট জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান্ ভাবিয়া

থাকেন, ফলতঃ সকলের একমত হওয়া অসম্ভব। আত্ম-গরিমাই তাঁহাদের প্রতিপক্ষতাচরণ করে, একজন অপরের নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিতে সততই কুণ্ঠিত হন, কিন্তু স্বীয়মত সমর্থনের নিমিত্ত কুতর্কের অনুসরণ করিতে কিঞ্চিৎ মাত্র লজ্জিত বা ত্রস্ত হন না। ইহারা দূর হইতে কুসুম-কোরকের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাই চয়নে ব্যস্ত হন, ইহারা একবার মুহূর্ত্তের তরেও চিন্তা করেন না যে, কুসুম-কোরক বৃন্তচ্যুত করিলে ইহার বাহ্যিক সৌকুমার্য্য দর্শনে ও সুমধুর সৌরভ আঘ্রাণে বঞ্চিত হইবেন। বৎস! তুমি যদি অধৈর্য্য হইয়া কুতর্কের অনুসরণ করিলে, তবে স্বয়ং কোন বিষয়ের মীমাংসা করিয়া চিত্ত প্রসাদ লাভ করা দূরে থাকুক, অধিকন্তু অপরের সুখের পথে কণ্ঠক হইলে। বৎস! মানব আত্মগরিমার বিষম পঙ্কে পতিত হইলে পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্য বর্ত্তমান নাই, যাহা তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না; এমন কি সময়ে সময়ে মানব ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস করেন, তখন আর অধিক কথা কি! জগতে যত বিনয়ী ও নম্র, সত্যসন্ধ ও দয়াবান্ হইয়া চলিতে পারা যায়, ততই মঙ্গল ও প্রীতিকর। ধূপাদি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা যেরূপ বায়ুর সত্ত্বা অনুমিত হয়, তদ্রূপ বিনয় ও নম্রতা, সত্য ও

দয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত হইলে মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্ব উপলব্ধি হয়।

যিনি মায়াতীত, যিনি অনাদি অনন্ত, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি লয়কর্ত্তা, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র নির্ব্বিকার পূর্ণ সত্য, সেই মঙ্গলময় দেবাদিদেব অনাদি নাথের শ্রীপাদ-পদ্মে সতত প্রার্থনা, যেন আমাদের মতি গতি সেই ভগবৎ শ্রীচরণে রত থাকে, সেই সৎসঙ্গ বলে জগতীস্থ সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান জন্মিবে, চিত্তচাঞ্চল্য দূরে যাইবে, ভগবৎ প্রেম-নীরের পবিত্র সংস্পর্শে সাংসারিক মোহ-মায়া এবং জ্বালাযন্ত্রণা দূরে পলাইবে, অনন্ত স্বর্গলাভ হইবে, জগৎ সুখময় হইবে, অমূল্য মনুষ্যজীবন সার্থক হইবে।

আশ্চর্য্য 'সুন্দর,'
কিবা মনোহর,
এই যে অনাদিকীর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল।
কোথাও উত্তপ্ত রবির কিরণে,
কোথাও শীতল চন্দ্রিকা পতনে,
কোথাও ভীষণ পূর্ণ বালুকায়,
কোথাও সুন্দর বৃক্ষ লতিকায়,
জানে রে ইহার হেতু কে বল কেবল?

রবি শশী তারা,
নভস্তলে যারা,
পরম আলোকে করে শোভিত জগতে;
আজিও তাহারা শোভে সেইখানে,
দু'দিন আগেতে শোভিত যেখানে,
মাসের ভিতরে হ্রাস বৃদ্ধি হয়,
অন্য কোন ভেদ নাহি দৃষ্ট হয়,
নিয়ম অধীন এরা কা'র আজ্ঞামতে?

কালেতে আবার,
অনন্ত বিকার,
মানব বুদ্ধিতে যাহা বুঝে উঠা ভার;
বিস্তীর্ণ নগর ভীমারণ্যময়,
গভীর অর্ণব মরুভূমি হয়,
উন্নত শিখর মাটীতে মিশায়,
সমতল ভূমি উচ্চ হ'য়ে যায়,
এ সকল হয় বল কৌশলে কাহার?

ভাবনা রে মন,
তিনি রে কেমন,
ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল যিনি করেন সৃজন।
সুনীল অম্বর, রবি, শশী, তারা,
বৃক্ষ, লতা, ফুল শোভে নিত্য যারা,
নদ, নদী, হ্রদ, পর্ব্বত, কন্দর,
নর, নারী আর যা'কিছু সুন্দর,
যাঁহার কৌশলে সব হয়েছে সৃজন!

হেন সাধ্য কার,
বিভুর আঁকার,
যতন সাধন বিনা জানে অনায়াসে?
কত শত যোগী ইহার তরেতে
পড়ে আছে কোথা গিরি কন্দরেতে,
হরি অহি গজে কভু নাহি ত্রাসে,
গ্রীষ্ম বর্ষা শীত সহে অনায়াসে,
জানিবে কেমনে তাঁরে সামান্য আয়াসে?

বল নিরাকার,
বল রে সাকার,
বলরে মনের সাধে বিবিধ প্রকার।
দেখ নাকি চেয়ে মদমত্ত নর,
আছে বহু বস্তু ধরণী ভিতর,
যাহা হয় ক্ষুদ্র তৃণ এ ধরার,
যাহার কিছুই বুঝিতে না পার,
জানিবে কেমনে তাঁরে ভাব একবার?

এই যে ধরণী,
পবিত্রা জননী,
আদ্যন্ত ইহার কেরে দেখেছে জগতে?
জ্ঞান অভ্যুদয়ে নব আবিষ্কার,
শিশু যথা দেখে মাতার আকার,
বয়সের সাথে বাড়িতে বাড়িতে;
মন অভিলাষ পারি না সাধিতে
যখন দেখিব ভাবি ধরা বিধিমতে।

দুর্গম কান্তার,
ভীষণ আকার,
আছে আজো বহুস্থান নহে আবিষ্কৃত।
পড়ে যথা সদা তুষারের ধারা,
যেন মা ধরণী হ'য়ে আত্মহারা,
বিরলে বসিয়া করিতে শীতল
শোক মগ্ন হিয়া ঢালে অশ্রুজল
অবোধ সন্তানে হেরি তম অলঙ্কৃত।

তম জ্বরে জ্বরে,
নানা তর্ক করে,
ভুলেও ভাবেনা তারা জগত ঈশ্বরে।
মায়াবদ্ধ নর কিছুই ভাবে না,
দেখেও চেতেনা জেনেও জানে না,
শত শত নর প্রতিদিন মরে,
নহে এ সংসার চিরদিন তরে,
কেঁদে মরে ধরামাতা এই দুঃখ ভরে।

দেখ নাকি চেয়ে,
মাতৃ বক্ষঃ ধেয়ে,
অবিরল অশ্রুধারা বহে চলে যায়।
কেমনেরে তোরা সন্তান হইয়া,
নিশ্চিন্ত ভাবেতে থাকিস বসিয়া,
পার নাকি তাঁর নয়ন মুছাতে?
পার নাকি তাঁর এ দুঃখ ঘুচাতে?
ভুলে কি তাঁহার প্রতি চেয়েছ গো হায়?

চাও একবার,
সে দুঃখ নিবার,
মাতৃ মন তুষ্ট কর ডাকিয়া ঈশ্বরে।
এবে ধৈর্য্য ধর ত্যজ এই সব,
অলীক আমোদ সংসার বিভব,
মন প্রাণ তাঁরে কর সমর্পণ,
বিভুর চরণ লহরে শরণ
মানব জনম ভবে চরিতার্থ ক'রে।

যাঁহার স্মরণে,

মানস গগনে,

শান্তি-পূর্ণ-শশী যেন অন্ধকার হরে।

কি সে নামামৃত মাধুরী মাথায়,

জ্ঞান দম্ভ মান দূরে চলে যায়,

সর্ব্বজীবে সদা আত্ম জ্ঞান হয়,

প্রেম সুধা সদা উথলি হৃদয়

মানব জনম ভবে চরিতার্থ করে॥

সম্পূর্ণ।